POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবন্ধ করা হইল, যেরূপে তোমদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা বিধিবন্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার। (আল বাকারা: ১৮৪)

بسم الله الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلّی علیٰ رسوله الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 13

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 31 মার্চ, 2022 27 শাবান 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

রোযা বর্ম স্বরূপ

১৭৯৪) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) -র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: রোযা বর্মস্বরূপ। অতএব, কেউ যেন অশ্লীল কথা না বলে, অজ্ঞতাপূর্ণ কথা না বলে। যদি কেউ তার সঙ্গে ঝগড়া করে বা তাকে গালি দেয়, তবে তার তাকে দুই বার একথা বলা উচিত, যে- আমি রোযাদার। সেই সত্তার নামে শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে; রোযাদারের মুখের সুবাস আল্লাহ্‌র নিকট কস্তুরির সুগন্ধি থেকেও বেশি প্রিয়। (আল্লাহ্ তা'লা বলেন) সে নিজের পানাহার এবং সহবাস আমার কারণে বর্জন করে। রোযা আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান। আর পুণ্যের প্রতিদান দশগুণ।

১৭৯৬) হযরত সোহেল (রা.) নবী করীম (সা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা.) বলেছেন: জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে যার নাম রাইয়ান। কিয়ামত দিবসে রোযাদাররা সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া কেউ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রশ্ন করা হবে: রোযাদার কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তাদের ছাড়া কেউ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। যখন তারা প্রবেশ করবে তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর আর কেউ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুস সওউম)

জুমআর খুতবা, ১৮ ফেব্রুয়ারী ও ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২ ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।

এটা অত্যন্ত দুঃখজননক যে ইউক্রেনে যুদ্ধ বেঁধে গেছে আর পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমি রাশিয়া, ন্যাটো এবং সকল পরাশক্তিগুলির প্রতি জোরালো আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন নিজেদের সকল প্রচেষ্টা মানবতার অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে যাবতীয় বিবাদ নিরসনের জন্য ব্যয় করে এবং কূটনীতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধান সূত্র সন্ধান করে।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের সাম্প্রতিক বিবাদ নিয়ে ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) -এর বিবৃতি

প্রেস বার্তা (২৪ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২২)

রাশিয়া ও ইউক্রেনের সাম্প্রতিক বিবাদ নিয়ে ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন-

বিগত কয়েক বছর ধরে আমি বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলিকে এই মর্মে সতর্ক করে আসছি যে ইতিহাস থেকে, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত দুটি বিভীষিকাময় যুদ্ধ থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এ সম্পর্কে আমি বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাকে পত্র লিখে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে তারা যেন নিজেদের জাতিগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থ সরিয়ে রেখে সমাজের সর্বস্তরে প্রকৃত ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দেয়।

এটা অত্যন্ত দুঃখজননক যে ইউক্রেনে যুদ্ধ বেঁধে গেছে আর পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এছাড়া রাশিয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ এবং তার উপর ন্যাটো ও বৃহৎ শক্তিগুলির প্রতিক্রিয়ার কারণে এই যুদ্ধ আরও ব্যাপক আকার ধারণ করাও সম্ভব আর এতে সন্দেহ নেই যে, এর পরিণাম ভীষণ ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক হবে। অতএব, আর যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় না বাড়িয়ে এর থেকে রক্ষা পাওয়ার যথাসম্ভব চেষ্টা করা সময়ের আশু প্রয়োজন। এখনও সময় আছে, পৃথিবী ধ্বংসের মুখ থেকে পিছিয়ে আসুক। আমি রাশিয়া, ন্যাটো এবং সকল পরাশক্তিগুলির প্রতি জোরালো আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন নিজেদের সকল প্রচেষ্টা মানবতার অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে যাবতীয় বিবাদ নিরসনের জন্য ব্যয় করে এবং কূটনীতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধান সূত্র সন্ধান করে।

জামাত আহমদীয়া মুসলেমার নেতা হিসেবে আমি কেবল এতটুকুই করতে পারি যে, বিশ্বের রাজনৈতিক নেতাদের মনোযোগ এদিকে ফিরিয়ে দিতে পারি, যার ফলে তারা বিশ্ব শান্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিজেদের জাতিস্বার্থ ও পারস্পরিক বৈরিতাকে দূরে রাখবে। তাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা, বিশ্বের নেতারা নিজেদের বিবেচনা বোধের পরিচয় দিক আর মানবতার উন্নতির জন্য চেষ্টা করুক।

আমি দোয়া করি, আজ এবং ভবিষ্যতেও বিশ্বের নেতারা যেন যুদ্ধ, রক্তক্ষয় এবং ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য সদর্থক ভূমিকা পালন করে। আমি আন্তরিকভাবে দোয়া করি যে, বৃহৎ শক্তিগুলির নেতাগণ এবং তাদের সরকার এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না যা আমাদের সন্তান ও আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করবে। বরং তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম হওয়া উচিত এ বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য যে- তারা নিজেদের আগামি প্রজন্মের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ পৃথিবী রেখে যাবে।

আমি দোয়া করি, বিশ্ব নেতারা সময়ের স্পর্শকাতরতা উপলব্ধি করুক এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করুক। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষকে নিজ নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আশ্রয় দিন এবং পৃথিবীতে প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। আমীন।

মির্যা মসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ আল খামিস
ইমাম জামাত আহমদীয়া মুসলেমা
****

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

তোমরা সব সময় একথা স্মরণ রেখো যে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে দেখছেন। তোমরা যা কিছু কর তা তিনি দেখছেন।

নিজের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ কর এবং তা অর্জনের জন্য অনেক পরিশ্রম কর।

আমরা যদি আঁ হযরত (সা.)-এর জন্মদিন পালন না করে থাকি তবে আমাদের নিজেদের জন্মদিন উদযাপন করার প্রয়োজন কি?

তোমরা নিজেদের পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে মিলে মিষ্টি জাতীয় খাবার তৈরী করে কিছুটা ভাল সময় কাটাতে পার। কিন্তু অনেক মানুষকে ডেকে আনা এবং অর্থ অপচয় করার অনুমতি নেই।

তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর উপর আমল কর আর যুগ খলীফার নির্দেশাবলী মেনে চল, তবে এর অর্থ হল তোমরা খিলাফতকে ভালবাস।

দোয়া কর, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে শীঘ্রই গ্যাম্বিয়া যাওয়ান তৌফিক দেন। আমি সেখানে যেতে চাই। আমি জানি না যে আমার গ্যাম্বিয়া যাওয়ার জন্য তোমরা বেশি ব্যকুল না কি আমি।

গ্যাম্বিয়ার মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যদের সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত

হুযুর আনোয়ার ৩০ শে মে, ২০২০ তারিখে গ্যাম্বিয়ার মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যদের সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত করেন।

হুযুর তাঁর ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড)-এর অফিস থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আর আর আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যরা গ্যাম্বিয়ার হেড কোয়াটার থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তেলাওয়াতের মাধ্যমে। অতঃপর নিজেদের আকিদা এবং বর্তমান যুগের সমস্যাবলী সংক্রান্ত প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়।

মজলিসে উপস্থিত একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, খোদা তা'লার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরী করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় কোনটি?

হুযুর আনোয়ার বলেন- সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল, তোমরা সব সময় একথা স্মরণ রেখো যে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে দেখছেন। তোমরা যা কিছু কর তা তিনি দেখছেন। যখন একথা তোমাদের মনে গেঁথে যাবে তখন তোমরা অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকবে আর আল্লাহ্ তা'লা যে সব কাজ করার আদেশ দিয়েছেন সেগুলি করার চেষ্টা করবে আর যেগুলি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি বর্জন করবে। তাই সব সময় স্মরণ রাখবেন যে আল্লাহ্ আপনাদের প্রত্যেকটি কাজ দেখছেন। যেখানেই আপনারা থাকুন। মানুষের কাছ থেকে নিজেকে গোপন করতে পারেন, কিন্তু খোদার দৃষ্টি থেকে লুকোতে পারবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পাঁচ ওয়াক্ত নামায অনিবার্য করেছেন। তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রত্যহ অবশ্যই পড়া উচিত। আর সেজদায় এই দোয়া করা উচিত যে আল্লাহ্ তা'লা যেন তোমাদের ঈমানে দৃঢ়তা দান করেন। আর এই দোয়াও করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে যেন তোমাদের দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হয় আর তোমাদের দোয়াসমূহ তিনি কবুল করেন।

একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, একজন ছাত্র কিভাবে সফল হতে পারে এবং সময়ের সাথে সাথে আরও বেশি উন্নতি করতে পারে? হুযুর আনোয়ার বলেন: ছাত্র হিসেবে তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তোমাদের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। যদি তুমি ডাক্তার হতে চাও তবে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। যদি ইঞ্জিনিয়ার বা উকিল হতে চাও বা অন্য কোনও পেশায় যেতে গেলেও পরিশ্রম করতে হবে। নিজের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ কর এবং তা অর্জনের জন্য অনেক পরিশ্রম কর।

একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, মুসলমানদের জন্য জন্মদিন পালন করা করা উচিত কি না?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদী মুসলমান হিসেবে তোমরা নিজেদের বাড়িতে জন্মদিন পালন করতে পার। কিন্তু অন্যদেরকে বাড়িতে ডেকে এনে অর্থ অপচয় করার প্রয়োজন নেই। তোমরা নিজেদের পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে মিলে মিষ্টি জাতীয় খাবার তৈরী করে কিছুটা ভাল সময় কাটাতে পার। কিন্তু অনেক মানুষকে ডেকে আনা এবং অর্থ অপচয় করার অনুমতি নেই। আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর জন্মদিন পালন করি না, আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কিম্বা কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্মদিনও পালন করি না। তাই আমরা যদি আঁ হযরত (সা.)-এর জন্মদিন পালন না করে থাকি তবে আমাদের নিজেদের জন্মদিন উদযাপন করার প্রয়োজন কি? তাই তোমরা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এই দিনটি উদযাপন করতে পার। তোমার মা তোমার জন্য কিছু ভাল খাবার তৈরী করতে পারে, যেমন কেক বা পেস্ট্রী জাতীয় মিষ্টি খাবার যা তুমি পছন্দ কর।

হুযুর আনোয়ার আরও বলেন: যেমনটি আমি বলেছি, তোমরা বাড়িতে জন্মদিন পালন করতে পার, কিন্তু তাতে বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রিত করো না, এটা অর্থ ও সময় অপচয় করা। এর পরিবর্তে, যদি তোমাদের হাতে অর্থ থাকে তবে সদকা-খয়রাত করতে পার যাতে গরীবরাও তোমাদের টাকায় কিছু খাওয়া দাওয়া করে উপকৃত হয়। পৃথিবীতে কিছু মানুষ এমনও আছে যারা প্রতিদিন খাবার পায় না; তারা নিদারুন দারিদ্রে ডুবে আছে, কষ্টে আছে। তাই বৃথা কাজে অর্থ অপচয় না করে গরীবদের সাহায্য করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের গুরুত্ব স্পষ্ট করতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন: দুই রাকাত নফল নামায পড়ার মাধ্যমে তোমাদের জন্মদিন পালন করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, তিনি তোমাদেরকে এই জীবন দিয়েছেন এবং অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। আর তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং দোয়া করা উচিত যে, তিনি যেন তোমাদেরকে আরও দান করতে থাকেন যাতে তোমরা জামাত এবং দেশের জন্য কল্যাণকর সত্তা হতে পার।

একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, কিভাবে খিলাফতের সেবা এবং এর প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ করা যায়? হুযুর আনোয়ার বলেন: তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর উপর আমল কর আর যুগ খলীফার নির্দেশাবলী মেনে চল, তবে এর অর্থ হল তোমরা খিলাফতকে ভালবাস।

হুযুর আনোয়ার যুগ খলীফার নির্দেশাবলী মেনে চলার গুরুত্ব স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন: যুগ খলীফার পক্ষ থেকে যে নির্দেশই তোমরা পাও তা তোমরা শিরোধার্য কর। কেননা যুগ খলীফা তোমাদেরকে সব সময় কুরআন করীমের শিক্ষা অনুসারে এবং রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত অনুসারে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এসবের যা ব্যাখ্যা করেছেন সেই অনুসারে নির্দেশ দেয়। তাই তোমরা যদি যুগ খলীফার নির্দেশ মেনে চল, তাঁর খুতবা শুনে থাক, তবে এর অর্থ হবে, তোমরা যুগ খলীফাকে ভালবাস এবং খিলাফতের তোমরা সাহায্যকারী এবং রক্ষী হওয়ার অধিকার রাখ।

হুযুর আনোয়ার গ্যাম্বিয়া আসুন, এই বাসনার কথার উল্লেখ করলে হুযুর আনোয়ার বলেন, এর জন্য দোয়া কর। দোয়া কর, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে শীঘ্রই গ্যাম্বিয়া যাওয়ার তৌফিক দেন। আমি সেখানে যেতে চাই। আমি জানি না যে আমার গ্যাম্বিয়া যাওয়ার জন্য তোমরা বেশি ব্যকুল না কি আমি। আমাদের উভয়ের দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যেদিন আমাদের দোয়া কবুল করবেন সেদিন আমি গ্যাম্বিয়া যাব। ইনশাআল্লাহ্। আর সেখানে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাতও করব।

শেষের পাতার পর....

ফেরত আসার সময় বা প্রাতঃভ্রমণের সময় বা সফরের সময় আফ্রিকায় বা কোন হোটেলে বসে খাবার খাওয়ার সময় বা বিশ্রমাগারে অপেক্ষারত অবস্থায় পুলিশের কর্মকর্তাই হোক বা সেনা কর্মকর্তা, যাদের সাথেই সাক্ষাৎ হতো (তিনি) তাদের তবলীগ করতেন এবং কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। কোথাও কোন মানুষকে দেখলে আমরা বলতাম, এখন আমাদের বাবা এই ব্যক্তিকে দেখেছেন (তিনি আব্বার হাত থেকে) বঁাচতে পারবেন না, তাকে (তিনি) তবলীগ করেই ছাড়বেন।

অতঃপর তার এক ছেলে বলেন, বাবা বলেছেন, আফ্রিকায় তবলীগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা দেখা দেয়, অনেক দোয়া করেছি, তাহাজ্জুদ পড়ার পর সেজদায় আওয়াজ শুনতে পাই "আমার প্রকৃতিতে ব্যর্থতার কোনো উপাদান নেই"। (তিনি) বলেন, পরবর্তী দিন তবলীগের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা ছিল তা দূর হয়ে যায়। যাহোক, তার সম্পর্কে অনেক মানুষ বিভিন্ন ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন আর প্রত্যেকে এটিই লিখেছেন যে, (মরহুম) মিশুক ছিলেন, বিনয়ী ছিলেন, দোয়াকারী ছিলেন। খিলাফতের সাথে (মরহুমের) ছিল দৃঢ় সম্পর্ক এবং মহান আল্লাহ্‌র প্রতি তিনি পরিপূর্ণ আস্থাশীল একজন মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। (মরহুমের) পদমর্যাদা উন্নত করুন। তার সন্তানসন্ততিকে তার পুণ্যকর্ম সমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

****

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ আমাকে কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং বর্তমানে তিনিই আমাকে কুরআন শিখানোর জন্য জগদ্বাসীর শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই উদ্দেশ্যে দাঁড় করিয়েছেন যেন আমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) ও পবিত্র কুরআনের নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিই এবং ইসলামের বিপরীতে জগতে বিদ্যমান সকল মিথ্যা ধর্মকে পরাজিত করি।"

"পৃথিবী সর্বশক্তি প্রয়োগ করুক। তারা তাদের সমস্ত শক্তি ও জনবল একত্রিত করুক আর খ্রিষ্টান বাদশাহরা ও তাদের সকল রাজত্ব সমবেত হোক, এছাড়া ইউরোপ এবং আমেরিকাও যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় আর পৃথিবীর সকল বড় সম্পশালী পরাশক্তিগুলোও যদি এক হয়ে যায় আর আমাকে এই উদ্দেশ্যে ব্যর্থ করতে একতাবদ্ধ হয়ে যায় তবুও আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, তারা আমার বিরুদ্ধে ব্যর্থমনোরথ হবে। খোদা আমার সকল দোয়া এবং পরিকল্পনার বিপরীতে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র, কুটচাল ও প্রতারণাকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। এছাড়া খোদা আমার মাধ্যমে অথবা আমার শিষ্য এবং অনুসারীদের মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণের জন্য মহানবী (সা.)-এর নামের কল্যাণ ও বদৌলতে ইসলাম ধর্মের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আর তারা সেই সময় পর্যন্ত পৃথিবীবাসীকে অবকাশ দেবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলাম পুনরায় নিজ পূর্ণ মহিমার সাথে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আবারো জগতের জীবন্ত নবী হিসেবে গ্রহণ করা হয়।"

আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এমনভাবে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছিলেন যে, তাঁর ৫২ বছরের জীবন এর সাক্ষী। হোক সেটি ধর্মীয় বা জাগতিক কোনো বিষয়, যখনই তাঁকে কোনো বিষয়ে লিখতে বা বলতে বলা হয়েছে তখন তিনি (রা.) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্রোত বইয়ে দিয়েছেন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত** ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (১৮ তবলীগ, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:প্রতিবছর ২০শে ফেব্রুয়ারি আমরা মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে জলসা করি এবং এদিনটি স্মরণ করি।ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুদের বিভিন্ন আপত্তির উত্তরে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ লাভ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একজন পুত্র সন্তান লাভের এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ইসলামের শত্রুরা বলে, ইসলাম কোন নিদর্শন দেখায় না। তিনি (আ.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদপ্রাপ্ত হয়ে বলছি, ইসলামের সত্যতার একটি বড় নিদর্শন যা আমার মাধ্যমে পূর্ণ হবে তা হল, আমার ঘরে এক পু ত্র সন্তান হবে। যে দীর্ঘজীবন লাভ করবে, ইসলামের সেবা করবে। তিনি আরও বলেছেন, তার মাঝে অমুক অমুক গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকবে। প্রায় বায়ান্ন বা তেপ্পান্নটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। এটি কোন সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না। একটি নির্দিষ্ট সময়ও বলে দিয়েছেন, আর সেই (নির্ধারিত) সময়ের মধ্যে সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং সে দীর্ঘজীবনও লাভ করে আর সে ইসলামের অসাধারণ সেবার সৌভাগ্য লাভ করে। প্রত্যেক বছর এই ভবিষ্যদ্বাণীর বরাতে জামাতের জলসাগুলোতে বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোকপাত করা হয়। এবছরও ইনশাআল্লাহ্ বিভিন্ন জামাতে জলসা হবে (আর সেখানেও) এসব আলোচনা হবে। এছাড়া এমটিএ-তেও অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয়। সেখান থেকে(অর্থাৎ এমটিএ থেকে) বিস্তারিত জানা যাবে। এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র নিজের ভাষায় তাঁর প্রাথমিক জীবন কেমন ছিল আর তাঁর স্বাস্থ্য কেমন ছিল এবং তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার কীরূপ ছিল- এ সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো।

দীর্ঘায়ু লাভকারী সন্তান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, এক সন্তান দীর্ঘায়ু লাভ করবে। সেই দীর্ঘজীবন লাভকারী সন্তানের স্বাস্থ্যের অবস্থা কেমন ছিল তার ধারণা আপনারা কিছুটা এখান থেকে পেতে পারেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) স্বয়ং বলেন, শৈশবে আমার স্বাস্থ্য খুবই দুর্বল ছিল। প্রথমে আমার হুপিং কাশি হয় এরপর আমার স্বাস্থ্য এতোটাই ভেঙ্গে পড়ে যে, ১১-১২ বছর বয়স পর্যন্ত জীবন-মৃত্যুর দোলাচালে দুলতে থাকি। আর সাধারণভাবে এটিই ধরে নেওয়া হয় যে, আমার দীর্ঘ জীবন লাভ করা সম্ভব নয়। এরই মধ্যে আমার চোখের পীড়া দেখা দেয় আর এতো বেশি ব্যাথা হয় যে, আমার একটি চোখ বলতে গেলে অকেজোই হয়ে যায়। সে চোখে দেখা যেতো না অর্থাৎ সেচোখে আমি খুবই সামান্য দেখতে পাই। যখন একথা বলছিলেন, তিনি বলেন, এখনও খুবই কম দেখতে পাই। এরপর যখন আমি আরও বড় হই তখন লাগাতার ৬-৭ মাস পর্যন্ত আমার জ্বর আসতে থাকে। আর আমাকে যক্ষারোগী আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ TB রোগী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আর তিনি (রা.) বলেন, এসব কারণে আমি নিয়মিত পড়াশোনাও করতে পারতাম না। স্কুলে যেতাম না। লাহোরের মাস্টার ফকীর উল্লাহ্ সাহেব, {তিনি (রা.) লাহোরেই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন} যার মুসলিম টাউনে বাংলো আছে, তিনি আমাদের স্কুলে অংক পড়াতেন। তিনি একবার আমার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে অভিযোগ করেন যে, এ পড়তে আসে না আর প্রায় সময়ই স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অসন্তুষ্ট হবেন ভেবে আমি ভয় পাই কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মাস্টার সাহেব! এর শরীর দুর্বল থাকে, সে যে কখনো কখনো স্কুলে চলে যায় আর কোন কথা তার কানে পড়ে এতেই আমরা (খোদার প্রতি) কৃতজ্ঞ, এর ওপর বেশি চাপ দিবেন না। তিনি বলেন, এমনকি আমার মনে পড়ে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) একথাও বলেছিলেন, তাকে অংক শিখিয়ে আমরা কী করবো? তাকে দিয়ে কি আমরা দোকান করাবো?

অতএব, এ ছিল তার শৈশবের স্বাস্থ্যগত বাস্তবতা ও বিদ্যালয় যাওয়ার অবস্থা। এমতাবস্থায় কে তার দীর্ঘ আয়ুর নিশ্চয়তা দিতে পারে। শুধু দীর্ঘায়ুরই নয় বরং সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে একথাও ছিল যে, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে সমৃদ্ধ করা হবে। তার এহেন অবস্থায় কে বলতে পারে যে, এই ছেলে জ্ঞানও অর্জন করবে? যাহোক হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, (এই ছেলে) কুরআন ও হাদীস পড়তে পারলেই যথেষ্ট। তিনি বলেন, মোটকথা আমার স্বাস্থ্য এমন যে, জাগতিক জ্ঞান অর্জনে ছিল সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য। আমার দৃষ্টিশক্তিও দুর্বল ছিল আর আমি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মেট্রিক পরীক্ষায়ও অকৃতকার্য হই, কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি নি কিন্তু খোদা তা'লা আমার সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, আমি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবো। তাই যদিও আমি জাগতিক কোন পড়ালোখা করি নি তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'লা এমন এমন জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাদি আমার কলমে লিখিয়েছেন, জগতবাসী যা পাঠ করে হতভম্ভ। তারা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, এরচেয়ে উত্তম ইসলামী বিষয়াদির বিষয়ে আর কিছুই লেখা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, সম্প্রতি তফসীরে কবীর নামে আমি পবিত্র কুরআনের তফসীরের একটি খণ্ড লিখেছি এটি পাঠ করে বড় বড় বিরুদ্ধবাদীও স্বীকার করেছে যে, এমন তফসীর আজ পর্যন্ত লেখা হয় নি। তাছাড়া আমি প্রায়শই লাহোরে আসি আর এখানকার অধিবাসীরা জানেন যে, আমার সাথে কলেজের প্রফেসরগণ সাক্ষাত করতে আসেন, শিক্ষার্থীরা সাক্ষাত

করতে আসে, ডাক্তারগণ সাক্ষাত করতে আসেন, বিশিষ্ট আইনবিদ ও উকিলরা সাক্ষাত করতে আসে কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি বারও এমন হয় নি যে, কোন বিশিষ্ট আলেম আমার সামনে ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের ওপর কোন আপত্তি করেছে আর আমি ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকেই তাকে নির্বাক ও নিরুত্তর করে না দিয়েছি। তাদেরকে একথা স্বীকার করতেই হয়েছে যে, সত্যিই ইসলামের শিক্ষার ওপর কোনরূপ আপত্তি হতে পারে না। এটি কেবল আর কেবলই আল্লাহর কৃপা যাতে আমি ধন্য, নইলে আমি জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে কোন জ্ঞানই আমি অর্জন করি নি। কিন্তু আমি একথা অস্বীকার করতে পারি না যে, খোদা তা'লা আমাকে নিজ সন্নিধান হতে জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি স্বয়ং আমাকে সব ধরনের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান হতে অংশ দিয়েছেন।

এরপর তিনি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া সম্পর্কে অর্থাৎ, কীভাবে আল্লাহ তা'লা জ্ঞান শিখিয়েছেন- বলেন, আমি তখনো মাত্র বালক ছিলাম, আমি স্বপ্নে দেখি- একটি ঘণ্টা বেজে ওঠে আর তা থেকে ঢং ঢং আওয়াজ সৃষ্টি হয় যা বৃদ্ধি পেতে পেতে একটি ছবির ফ্রেমের রূপ ধারণ করে। এরপর আমি দেখি, এই ফ্রেমে একটি চিত্র ভেসে ওঠে। কিছুক্ষণ পর সেই ছবি নড়তে থাকে আর এরপর হঠাৎ সেটি থেকে এক সত্তা লাফ দিয়ে আমার সামনে চলে এসে বলে যে, আমি আল্লাহর ফিরিশতা। আমি তোমাকে পবিত্র কুরআনের তফসীর শেখাতে এসেছি। আমি বলি, শেখাও। তখন সে সূরা ফাতেহার তফসীর শেখানো আরম্ভ করে আর সে শেখাতে থাকে, শেখাতে থাকে আর শেখানো অব্যাহত রাখে। একপর্যায়ে সে যখন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন পর্যন্ত পৌঁছে তখন সে বলে যে, আজ পর্যন্ত যত তফসীরকারক গত হয়েছে তারা সবাই কেবল এই আয়াত পর্যন্তই তফসীর লিখেছে কিন্তু আমি তোমাকে এর পরবর্তী অংশের তফসীরও শিখাচ্ছি। অতএব সে পুরো সূরা ফাতেহার তফসীর আমাকে শিখিয়ে দেয়।

এই স্বপ্নের মর্ম মূলত এটিই ছিল যে, পবিত্র কুরআন বোঝার ক্ষমতা আমার মাঝে অন্তর্নিহিত করা হয়েছে। আর এই দক্ষতা আমার মাঝে এত পরিমান রয়েছে, আমি দাবি করে বলি, যে সভাতেই তোমরা চাও আমি এই দাবি করার জন্য প্রস্তুত আছি যে, আমি সূরা ফাতেহা থেকে সকল ইসলামী শিক্ষা বর্ণনা করতে সক্ষম।

তিনি জনসম্মুখে প্রকাশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন, পৃথিবীবাসীকে অবগত করছেন, চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন; কিন্তু এরূপ কখনই ঘটেনি যে তাঁর মোকাবেলায় কেউ এভাবে সামনে এসেছে। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, আমি ছোটই ছিলাম, স্কুলে পড়তাম। আমাদের স্কুলের ফুটবল টিম অমৃতসরের খালসা কলেজের টিমের সাথে খেলতে যায়। উভয় দল খেলে আর আমাদের টিম জয় লাভ করে। এতে মুসলমানরা আমাদের জামাতের সাথে বিরোধীতা থাকা সত্ত্বেও, যেহেতু এক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল সেজন্য অমৃতসরের এক নেতা আমাদের টিমকে চায়ের দাওয়াত দেয়। আমরা যখন সেখানে গেলাম তখন আমাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। আমি সেই বক্তৃতার জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। যখন আমাকে দাঁড় করানো হল তৎক্ষনাৎ ফেরেশতার তফসীর শিখানোর সেই স্বপ্ন মনে পড়ে গেল। তখন সর্বপ্রথম আমি এ বিষয়ে খোদা তা'লার কাছে দোয়া করলাম যে, হে খোদা! তোমার ফেরেশতা স্বপ্নে আমাকে সুরা ফাতেহার তফসীর শিখিয়ে গিয়েছিল। আজ আমি এ বিষয়টি পরীক্ষা করতে চাই যে, এই স্বপ্ন তোমার পক্ষ থেকে ছিল নাকি তা আমার নফসের কোন প্রতারণা ছিল?

যদি এ স্বপ্ন তোমার পক্ষ হয়ে থাকে তাহলে আজকে সূরা ফাতেহার এমন একটি বিশেষ গূঢ় কথা অবহিত কর যা ইতিপূর্বে পৃথিবীর কোন তফসীরকারক বর্ণনা করেনি। অতএব, এ দোয়ার অব্যবহিত পর খোদা তা'লা আমার হৃদয়ে একটি গূঢ় কথা সঞ্চার করেন। তখন আমি বলি, দেখ! খোদা তা'লা কুরআন করীমে 'গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যাল্লিন' দোয়া শিখিয়েছেন । অর্থাৎ, হে মুসলমানরা! তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে এবং নিজেদের নামাযের প্রত্যেক রাকা'তে এ দোয়া কর যে, আমরা যেন 'মাগযূব' এবং 'দ্বাল' না হয়ে যাই। মহানবী (সা.) স্বয়ং মাগযূবের অর্থ হাদীসে বর্ণনা করেছেন। যেমন, তিনি (রা.) বলেন, মাগযূবের অর্থ হল ইহুদী এবং 'দ্বাল'-এর অর্থ হল খ্রীষ্টান। তাই 'গায়রিল মাগযূব' এর অর্থ হলো, হে আল্লাহ্! আমরা যেন ইহুদী না হয়ে যাই এবং 'ওয়ালায দ্বাল্লীন' এর অর্থ হলো, আমরা যেন খ্রীষ্টান না হয়ে যাই। এ বিষয়টি এ হতেও স্পষ্ট হয় যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, এই উম্মতে একজন মসীহ্ আগমণ করবেন। তাই, যারা তাঁকে অস্বীকার করবে তারা অবশ্যই ইহুদী বৈশিষ্ট্যধারী হয়ে যাবে। অপরদিকে তিনি এটিও বলেছেন যে, খ্রীষ্টীয় ফিতনা এক যুগে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাবে। মানুষজন আয়-উপার্জন, চাকরি, সমাজে সম্মান অর্জনার্থে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে অথবা প্রতারিত হয়ে এবং নিজ ধর্মের শিক্ষা সঠিকভাবে না বুঝার কারণে খ্রীষ্টান ধর্মগ্রহণ করবে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো সূরা ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ হয় ,আর সে সময় খ্রীষ্টানরা ইসলামের বেশি বিরোধী ছিল না আর ইহুদীরাও না। তখন সবচেয়ে বেশি বিরোধীতা মক্কার মূর্তিপূজারীদের পক্ষ থেকে করা হত। অথচ এ দোয়া শেখানো হয়নি যে, হে আল্লাহ্! আমরা যেন মূর্তিপূজারী না হয়ে যাই বরং এ দোয়া শিখানো হয়েছে যে, হে আল্লাহ্! আমরা যেন ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান না হয়ে যাই। এথেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, মক্কার মূর্তিপূজারীদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে এবং সেগুলোর নামচিহ্নও অবশিষ্ট থাকবে না। তাই, তাদের বিষয়ে মুসলমানদের কোন দোয়া শেখানোর কোন প্রয়োজনই নেই। হ্যাঁ, ইহুদী ধর্ম অথবা খ্রীষ্টধর্ম বা উভয়ই অবশিষ্ট থাকবে তাই তাদের ফিতনা থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য সর্বদা দোয়া করা তোমাদের জন্য আবশ্যক হবে। আমার এই বক্তৃতা শেষ হলে বড় বড় নেতৃবৃন্দ আমার সাথে সাক্ষাত করে এবং বলে যে, আপনি কুরআন খুব ভালোভাবে পড়েছেন। আমরা সারা জীবনে এই গূঢ় কথা প্রথমবার শুনছি। সত্যিকার অর্থে একথাই প্রকৃত সত্য, সব তফসীর খুলে দেখ কুরআনের কোন তফসীরকারক আজ পর্যন্ত এই গূঢ় কথাটি বর্ণনা করেনি। যদিও সে সময় আমার বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছরের কাছাকাছি যখন আল্লাহ্ তা'লা এ গূঢ় বিষয়টি আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। বস্তুত, আল্লাহ্ তা'লা নিজ ফেরেশতার মাধ্যমে আমাকে কুরআন শরীফের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেছেন আর আমার মাঝে তিনি এমন এক দক্ষতা সৃষ্টি করেছেন যে কেউ যেভাবে ধনভান্ডারের চাবি পেয়ে যায় তদ্রুপ আমিও কুরআন করীমের তত্ত্বজ্ঞানের চাবি পেয়ে গেছি। পৃথিবীর কোন আলেম এমন নেই যে, আমার সামনে আসবে আর আমি পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব তার সামনে প্রকাশ করতে পারব না। এটি লাহোর। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। (তিনি লাহোরে এই বক্তৃতা করছিলেন।) বহু কলেজ এখানে খোলা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের বড় বড় জ্ঞানী লোক এখানে পাওয়া যায়। আমি তাদের সবাইকে বলছি, পৃথিবীর যে কোন বিষয়ের জ্ঞানী পণ্ডিত আমার সামনে আসুক, পৃথিবীর যে কোন প্রফেসর আমার সামনে আসুক, পৃথিবীর যে কোন বিজ্ঞানী আমার সামনে আসুক আর নিজের জ্ঞানবলে পবিত্র কুরআনের ওপর আক্রমণ করে দেখুক, আমি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাকে এমন উত্তর দিতে পারব যে, জগদ্বাসী স্বীকার করবে, তার আপত্তি খণ্ডিত হয়েছে। আর আমি দাবি করছি যে, আমি খোদার তা'লার বাণী থেকেই তার উত্তর দিব আর পবিত্র কুরআনের আয়াতের মাধ্যমেই তার আপত্তি সমূহ খণ্ডন করে দেখাব। (ম্যাঁয় হি মুসলেহ মওউদ কা মিসদাক হুঁ, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৭, পৃ: ২১৩-২১৭)

এই ঘটনার সময়, যেমনটি তিনি বলেছেন, তার বয়স ছিল ২০ বছর আর তখনই খোদা তা'লার প্রতি তার বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করেছিল। এই বিশ্বাস কোন্ বয়সে পূর্ণ হয়েছে- সে সম্পর্কে স্বয়ং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, যা থেকে এটিও জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে শৈশব থেকেই মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার সত্যায়নস্থল হিসেবে গড়ে তুলছিলেন।

যেমন তিনি বলেন, ১৯০০ সনটি আমার হৃদয়কে ইসলামী নির্দেশাবলীর প্রতি মনোযোগী করার কারণ হয়েছে। তখন আমার বয়স ছিল ১১ বছর। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য জনৈক ব্যক্তি ছিটকাপড়ের তৈরি একটি জুব্বা নিয়ে আসে। আমি তাঁর (আ.) কাছ থেকে সেই জুব্বা নিয়ে নিই। অন্য কোন ধারণায় নয়, বরং এই জন্য যে, সেটির রং এবং সেটির নকশা আমার পছন্দ ছিল। আমি সেটি পরতে পারতাম না, কেননা সেটির প্রান্ত আমার পায়ের নীচে এসে যেতো। আমার বয়স যখন ১১ বছর হয় আর ১৯০০ সন আরম্ভ হয় তখন আমার হৃদয়ে প্রশ্ন জাগে, আমি খোদা তা'লার ওপর কেন বিশ্বাস করি, তাঁর অস্তিত্বের কী প্রমাণ রয়েছে ? আমি রাতে দীর্ঘক্ষণ এই বিষয়ে চিন্তা করতে থাকি। অবশেষে দশটা বা এগারোটায় আমার হৃদয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, হ্যাঁ, একজন খোদা আছেন।

সেই ক্ষণটি আমার জন্য কতই না আনন্দের ক্ষণ ছিল, কতই না আনন্দের সময় ছিল! এক শিশু তার মা-কে পেলে যেভাবে আনন্দিত হয় অনুরূপ আনন্দ আমার হয়েছিল যে, আমার সৃষ্টিকর্তাকে আমি পেয়ে গেছি। ১১ বছর বয়সে এরূপ চিন্তাধারা ছিল! শ্রুত ঈমান দর্শনভিত্তিক ঈমানে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যাহোক তিনি বলেন, আমার আনন্দের কোন সীমা রইল না। আমি তখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি আর এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত দোয়া করতে থাকি যে, হে আমার খোদা! তোমার সত্তা সম্পর্কে যেন কখনো আমার সন্দেহ না জাগে। তখন আমার বয়স ছিল ১১ বছর আর আজ আমার বয়স ৩৫ বছর। কিন্তু আজও আমি এই দোয়াকে খুবই গুরুত্বর দৃষ্টিতে দেখি। আমি আজও এটিই বলি যে, হে আমার খোদা! তোমার সত্তা সম্পর্কে যেন আমার কোন সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। হ্যাঁ, তখন আমি এক বালক ছিলাম, আর এখন আমি অধিক অভিজ্ঞতা রাখি। এখন আমি (উক্ত দোয়াতে) এতটা যুক্ত করি যে, হে আমার খোদা! তোমার সত্তা সম্পর্কে যেন আমার নিশ্চিৎ বিশ্বাসভিত্তিক ঈমান জন্মে। যাহোক, তিনি বলেন, কথা ভিন্ন দিকে চলে গেছে। আমি লিখছিলাম যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি জুব্বা আমি চেয়ে নিয়েছিলাম। আমার হৃদয়ে যখন চিন্তাভাবনার সেসব স্রোত বইতে আরম্ভ করে, যেগুলোর উল্লেখ আমি উপরে করে এসেছি, তখন একদিন যুহা বা ইশরাকের সময় আমি ওযু করি আর সেই জুব্বাটি পরিধান করি; এজন্য নয় যে, সেটি সুন্দর, বরং এই জন্য যে,

এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এবং বরকতমণ্ডিত । খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি যে পবিত্র হয়ে থাকেন সে সংক্রান্ত এটি ছিল প্রথম অনুভূতি যা আমার হৃদয়ে জাগ্রত হয়। অতঃপর তিনি বলেন, এরপর আমি দরজা বন্ধ করে নিই আর কেঁদে কেঁদে অনেক দোয়া করি (আর) নফল নামায পড়ি।

(ইয়াদে আইয়াম, আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৫-৩৬৬)

কীভাবে তিনি এগারো বছর বয়সে খোদা তা'লার পরিচয় লাভ করেন সে বিষয়টি আরেক স্থানে তিনি আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার বয়স তখন এগারো বছর যখন আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় আমাকে প্রথাগত ধর্মবিশ্বাসকে ঈমানের স্তরে উপনীত করার এই সৌভাগ্য দান করেন। সময়টি ছিল মাগরিবের পর; আমি আমাদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ আমার মনে চিন্তা আসে- আমি কি এজন্য আহমদী যে, আমার বাবা আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা, নাকি এজন্য আহমদী যে, আহমদীয়াত সত্য এবং এই জামা'ত খোদা তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত? এই চিন্তা হতেই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, এবিষয়ে গভীর প্রণিধানের পরেই আমি এখান থেকে বের হবো। যদি আমি নিশ্চিত হই যে, আহমদীয়াত সত্য নয়, তাহলে আমি আর আমার কামরায় ঢুকব না, বরং এই উঠোন থেকেই বাইরে চলে যাব। এ ছিল এগারো বছরের এক বালকের চিন্তা ! তিনি বলেন, যাহোক, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আমি গভীরভাবে ভাবতে আরম্ভ করি এবং এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমার মাথায় কিছু যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত হয়, যেগুলো আমি বিশ্লেষণ ও খণ্ডনের চেষ্টা করি। কখনো একটি যুক্তি দিয়ে সেটিকে খণ্ডন করি; আবার দ্বিতীয় যুক্তি দিয়ে সেটি প্রত্যাখ্যান করি, আবার তৃতীয় যুক্তি দিয়ে সেটি খণ্ডন করি। এভাবে চলতে চলতে আমার সামনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, মুহাম্মদ (সা.) কি খোদা তা'লার সত্য রসূল ছিলেন? আমি কি এজন্য তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করি যে, আমার বাবা -মা তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন, নাকি আমি এজন্য তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করি যে, যুক্তি-প্রমাণের নিরিখে এ বিষয়টি আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষেই মহানবী (সা.) সত্য রসূল? যখন এই প্রশ্ন আমার সামনে উপস্থিত হয় তখন আমার মন বলে ওঠে, এখন আমি এই বিষয়টির সিদ্ধান্ত করেই ছাড়ব! এরপর স্বাভাবিকভাবেই খোদা তা'লা সম্পর্কেও আমার মনে প্রশ্ন আসে এবং আমি বললাম, এই প্রশ্নটিও সমাধান করা দরকার যে, আমি কি প্রথাগত বিশ্বাস হিসেবে খোদা তা'লাকে বিশ্বাস করি, নাকি আসলেই আমার ওপর এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে যে, বিশ্বজগতের একজন খোদা আছেন? তখন আমি আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নের ওপরও গভীরভাবে ভাবতে আরম্ভ করি এবং আমার মন বলে, যদি খোদা থেকে থাকেন, তবে মুহাম্মদ (সা.) সত্য রসূল, আর যদি মুহাম্মদ (সা.) সত্য রসূল হন, তবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও সত্য; আর যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্য হয়ে থাকেন, তবে আহমদীয়াতও নিশ্চিতভাবে সত্য। আর যদি বিশ্বজগতের কোন খোদা না থেকে থাকেন, তবে এঁদের কেউ-ই সত্য নন। যাহোক, তিনি বলেন, আমি সিদ্ধান্ত নিই- আজ আমি এই প্রশ্নের সমাধান করেই ছাড়ব। যদি আমার মন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, খোদা নেই- তবে আমি নিজের বাড়িতে থাকব না, বরং সাথে সাথে বাইরে বেরিয়ে পড়ব। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আমি চিন্তা করতে আরম্ভ করি এবং চিন্তা করতে থাকি। আমার বয়সের নিরিখে আমি এই প্রশ্নের কোন যৌক্তিক উত্তর দিতে পারি নি; [বয়সে খুব ছোট ছিলেন;] কিন্তু তবুও আমি ভাবতে থাকি, চিন্তা করতে করতে আমার মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

তখন আমি আকাশের দিকে তাকাই। সেদিন মেঘ ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা তাকে কীভাবে শেখাতে চাচ্ছিলেন দেখুন! তিনি বলেন, আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার ছিল এবং আকাশে তারাগুলি খুব স্পষ্টভাবে জ্বলজ্বল করছিল। এক ক্লান্ত মস্তিষ্কের জন্য এর চেয়ে বেশি আনন্দদায়ক দৃশ্য আর কী হতে পারে! [আমি ক্লান্ত ছিলাম, তাই আকাশ দেখছিলাম আর তারকারাজি উপভোগ করছিলাম] আমি তারা দেখতে থাকি, আর দেখতে দেখতে তারার জগতে হারিয়ে যাই। কিছুক্ষণ পর যখন আমার মস্তিষ্কে সতেজতা ফিরে আসে তখন আমি মনে মনে বলি, কী সুন্দর তারা! কিন্তু এই তারাগুলোর পর কী থাকতে পারে? আমার মস্তিষ্ক এই প্রশ্নের উত্তরে বলে, এগুলোর পরে আরও তারা থাকবে। আমি ভাবলাম, সেগুলোর পরে কী থাকতে পারে? এর উত্তরেও আমার মন বলে, সেগুলোর পর আরও তারা থাকবে। এরপর আমি ভাবলাম, ঠিক আছে, সেগুলোর পর কী থাকতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরেও আমার মন বলে, সেগুলোর পর আরও তারা থাকবে। আমি ভাবলাম, ঠিক আছে, তার পরে কী থাকতে পারে? এই প্রশ্নেরও আমার মন-মস্তিষ্ক সেই একই উত্তর প্রদান করে যে, আরও কিছু তারা থাকবে। তখন আমার হৃদয় বলে, এটি কীভাবে হতে পারে যে, একের পর দ্বিতীয় আর দ্বিতীয়ের পর তৃতীয় এবং তৃতীয়ের পর চতুর্থ পর্যায়েও তারকা থাকবে। এই ধারাবাহিকতা কি কোথাও শেষ হবে না? যদি শেষ হয় তাহলে তার পর কী আছে। এটিই সেই প্রশ্ন যার সম্পর্কে অধিকাংশ লোক হতভম্ব আর তারা বলে, আমরা যে বলি খোদা তা'লা হলেন অসীম সত্তা, এর অর্থ কী? আর আমরা যে বলি, খোদা তা'লা হলেন চিরস্থায়ী সত্তা, এরই বা কী অর্থ? কোন না কোন সীমা তো থাকা উচিত! একই প্রশ্ন আমার হৃদয়ে তারকারাজি সম্পর্কে সৃষ্টি হয়। আর আমি বললাম, এগুলো অবশেষে কোথাও গিয়ে শেষ হয় কি-না? যদি শেষ হয় তাহলে এর পর কী রয়েছে? আর যদি শেষ না হয় তাহলে এটি কীরূপ ধারাবাহিকতা যার কোন শেষ নেই! আমার চিন্তাধারা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছে তখন আমি বললাম, খোদা তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে সসীম-অসীমের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তোমরা খোদা তা'লার কথা বাদ দাও, এই তারকারাজি সম্পর্কে কী বলবে যেগুলো আমার চোখের সামনে রয়েছে। আমরা যদি এগুলোকে সীমাবদ্ধ বলি তাহলে সীমাবদ্ধ সেটি হয়ে থাকে যার পর অন্য জিনিস আরম্ভ হয়ে যায়। অতএব প্রশ্ন হলো প্রথমত যদি এগুলো সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে এগুলোর পর কী রয়েছে? আর যদি সেগুলো সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে সেগুলোর পর কী রয়েছে? আর যদি কোথাও বল যে, এগুলো অসীম তাহলে তারকারাজির অসীম হওয়ার বিষয়টি যদি মানুষ মেনে নিতে পারে তাহলে খোদা তা'লার অসীম হওয়ার বিষয়টি কেন মেনে নিতে পারবে না? তখন আমার হৃদয় বলে, হ্যাঁ , আসলেই খোদা আছেন, কেননা তিনি প্রকৃতির বিধানে সেই একই আপত্তি রেখে দিয়েছেন যা তাঁর সত্তা সম্পর্কে সৃষ্টি হয়। তিনি বলে দিয়েছেন যে, তুমি যদি আমাকে অদৃশ্য সত্তা মনে করে এই আপত্তি কর তাহলে যেসব জিনিস তুমি দেখতে পাচ্ছ সেগুলো সম্পর্কে তুমি কী উত্তর দিবে, যেখানে কিনা সেই একই আপত্তি যা তুমি আমার সম্পর্কে কর সেগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য আর তোমার কাছে এর কোন উত্তর নেই। তুমি খোদা তা'লা সম্পর্কে নির্দ্বিধচিত্তে এটি বলে দিবে, তিনি অসীম হওয়ার বিষয়টি আমরা বুঝতে পারি না। অপর স্থানে তিনি বলেন, এই যুক্তির মাধ্যমে খোদা তা'লার সত্তা আমার কাছে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার ফলে মহানবী (সা.)-এর সত্যতা আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সত্যতা-ও আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৯, পৃ: ৬৮৯-৬৯২)

যাইহোক আল্লাহ্ তা'লা যে তাকে জ্ঞানভাণ্ডারে পূর্ণ করেছিলেন- এর এটিও একটি প্রমাণ। সামান্য পড়াশোনা জানা এক বালকের হৃদয়ে এভাবে প্রশ্ন সৃষ্টি করেন আর এরপর নিজেই পথপ্রদর্শন করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সম্পর্কে কী ধারণা রাখতেন এর বহিঃপ্রকাশও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) করেছেন। তা থেকে প্রতিভাত হয় যে, তিনি এটিই মনে করতেন যে, এই বালক-ই মুসলেহ্ মওউদ হবে অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ এর সত্যায়নস্থল হবে। হযরত মু সলেহ্ মওউদ দু -একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বহুদিন আগের কথা। প্রথম দিকে আমি কতিপয় বন্ধুর সাথে মিলে 'তাশহীযুল আযহান' পত্রিকা চালু করেছিলাম। এই পত্রিকাটিকে পরিচিত করার জন্য যে প্রবন্ধ আমি লিখেছিলাম, যাতে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি যখন প্রকাশিত হয় তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে সেটির বিশেষ প্রশংসা করেন এবং নিবেদন করেন যে, এই প্রবন্ধটি অবশ্যই হুযূর (আ.) এর পড়ার যোগ্য। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে মুবারকে সেই পত্রিকা চেয়ে পাঠান আর সম্ভবত মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবের মাধ্যমে সেই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়ে শুনেন এবং এর প্রশংসা করেন। কিন্তু এরপর যখন আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি, প্রথমে তিনি প্রশংসা করলেও পরবর্তীতে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বলেন, মিঞা! তোমার প্রবন্ধ খুবই ভালো ছিল, কিন্তু আমি প্রীত হইনি। আমাদের দেশে একটি প্রবাদ রয়েছে যে, উটের দাম চল্লিশ আর তার ছানার বিয়াল্লিশ। অর্থাৎ একটি উটের মূল্য কম আর তার ছানার মূল্য দুই রুপি বেশি। তোমার ক্ষেত্রে এ সংবাদ সত্য প্রমাণিত হয় নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমি এতটা পাঞ্জাবী ভাষা জানতাম না।হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এর অর্থ আমার জন্য বোঝা সম্ভব ছিল না তাই আমার চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ দেখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, তুমি সম্ভবত এর অর্থ বুঝতে পার নি। তিনি [তথা খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)] বলেন, আমাদের এলাকায় একটি গল্প প্রচলিত আছে। কোন এক ব্যক্তি উট বিক্রি করছিল এবং সাথে উটের বাচ্চাও ছিল যাকে সেখানকার স্থানীয় ভাষায় 'টোডা' বলে। কেউ বিক্রেতাকে উটের মুল্য জিজ্ঞেস করলে সে বলে উটের দাম চল্লিশ রুপি কিন্তু 'টোডা'র মুল্য বিয়াল্লিশ রুপি। ক্রেতা জিজ্ঞেস করল, এ কেমন কথা! তখন বিক্রেতা বলে, 'টোডা' একদিকে উট আর অপরদিকে উটের ছানাও। ঠিক অনুরূপভাবে তোমার সম্মুখে ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনা বারাহীনে আহমদীয়া। যখন এটি প্রণয়ন করা হয় তখন তাঁর সম্মুখে তথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্মুখে এমন কোন ইসলামী সাহিত্য ছিল না কিন্তু তোমার সম্মুখে তো এটি (তথা বারাহীনে আহমদীয়া) ছিল আর (আমার) প্রত্যাশা ছিল, তুমি এর তুলনায় উন্নত কিছু উপস্থাপন করবে এবং এটি থেকে (তথা বারাহীনে আহমদীয়া দ্বারা) উপকৃত হবে। তখন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির তুলনায় উন্নত জ্ঞান আনার সাধ্য কার? এর প্রশ্নই ওঠে না। তবে তাঁর লুক্কায়িত জ্ঞানভাণ্ডার খুঁজে খুঁজে বের করে উপস্থাপন করা যায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর উক্ত কথার অর্থ হলো, পরবর্তী প্রজন্মের কাজ হয়ে থাকে অতীতের ভিত উঁচু করা।

অন্যদিকে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) তাঁর (রা.) শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধেও জানতেন এবং তাঁর (রা.) জ্ঞানের পরিধি সম্বন্ধেও অবগত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর (রা.) সম্পর্কে এত উন্নত ধারণা পোষণ করা সাব্যস্ত করে, তিনি (রা.) নিশ্চিত জানতেন যে, এ বালক এমন এবং তার মাঝে এমন সামর্থ আছে যে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ লিখতে সক্ষম। যাহোক, হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এটি এমন এক কথা, যদি পরবতী প্রজন্ম এটি মাথায় রাখে তাহলে নিজেরাও বরকত ও কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং জাতির জন্যও বরকত এবং কল্যাণের কারণ হতে পারে তবে নিজ পিতৃপুরুষের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা পুণ্যের বিষয়ে হওয়া উচিত, এমনটি নয় যে, চোরের সন্তান চেষ্টা করবে, সে যেন পিতার চেয়ে বড় চোর হতে পারে বরং উদ্দেশ্য হল, নামাযী ব্যক্তির সন্তান চেষ্টা করবে- সে যেন পিতার চেয়ে অধিক নামাযী হতে পারে।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৪-৪৮৫)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর শৈশবের স্বাস্থ্যগত বিষয়ের একটি ঘটনা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর (রা.) স্বাস্থ্য এবং জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ক আরও একটি ঘটনা রয়েছে। এটিও মূলত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তাঁর (রা.) প্রতি ভালবাসা এবং স্নেহের ঘটনা যা এটিও প্রমাণ করে যে, তাঁরা উভয়ে এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন উক্ত সন্তান মুসলেহ্ মওউদ হতে যাচ্ছেন।

উক্ত ঘটনার বিষয়য়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, 'আমার শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)। তিনি যেহেতু একদিকে হেকিম ছিলেন এবং পুস্তকের দিকে অধিক সময় তাকিয়ে থাকা আমার স্বাস্থ্যগত কারণে সম্ভব ছিল না- একথাও তিনি জানতেন তাই তিনি একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতেন আর তা হল, আমাকে তাঁর পাশে বসাতেন আর বলতেন, মিয়া! আমি পড়ছি, তুমি শুনতে থাকো। এরপর তিনি (রা.) তাঁর স্বাস্থ্যের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, শৈশবে আমার চোখে ট্র্যাকোমা হয়ে যায় [পূর্বেও তাঁর চোখের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে] এবং অব্যাহতভাবে তিন-চার বছর আমার চোখে ব্যথা হতে থাকে আর ট্র্যাকোমার কারণে ভয়ানক পীড়া হত, এতটাই যে, ডাক্তাররা বলে দেয়, এর চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। একারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার চোখের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা শুরু করেন এবং এর পাশাপাশি আমার জন্য তিনি (আ.) রোযাও রাখা আরম্ভ করেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি (আ.) সেসময় কতগুলো রোযা রেখেছিলেন- আমার ঠিক স্মরণ নেই। যাইহোক তিন থেকে সাতটি রোযা তিনি রেখেছিলেন। শেষ রোযার দিন তিনি যখন ইফতার করতে যাচ্ছিলেন এবং রোযা খোলার জন্য মুখে কোন জিনিস পুরলেন তখন আমি হঠাৎ চোখ খুলি এবং উচ্চস্বরে বলি, আমি দেখতে পাচ্ছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন ইফতারের সময় ইফতার করছিলেন তখন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, আমি চোখ খুলি এবং চোখ খুলে বলি, আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই রোগের প্রাবল্য ও অনবরত আক্রমণের ফলাফল এই দাঁড়াল যে, আমার এক চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেল। এর বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, মোটকথা আমার বাম চোখের দৃষ্টিশক্তি নেই। আমি এই চোখ দিয়ে পথ নির্ণয় করতে পারলেও বই পড়তে পারি না। যদি আমার পরিচিত কোন ব্যক্তি দুই চার ফিট দুরত্বে বসে থাকে তাহলে আমি তাকে দেখে চিনতে পারি কিন্তু অপরিচিত কেউ বসে থাকলে তার চেহারা আমি চিনতে পারি না। আমার শুধু ডান চোখ কাজ করছিল এবং তাতেও আবার ট্র্যাকোমা দেখা দেয়। আর এই ছত্রাক এত বেশী ছিল যে, আমি অনেক রাত বিনিদ্র কাটিয়েছি। সুতরাং এ ছিল তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা। অপর দিকে তাঁর জ্ঞানগত কর্মের দিকে লক্ষ্য করুন কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন তাঁকে ধন্য করেছে।

যাহোক তিনি (রা.) বলেন, বস্তুত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার শিক্ষকদের বলে দিয়েছিলেন যে, "পড়াশুনা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে, যতটুকু সে পড়তে চায় ততটুকুই পড়বে। আর পড়তে যদি না চায় তাহলে তাকে পড়তে বাধ্য করার প্রয়োজন নেই। পড়াশুনার চাপ সহ্য করার মত স্বাস্থ্যের অবস্থা তার নেই।" হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারবার আমাকে শুধু এই কথাই বলেছেন যে, "তুমি হযরত মৌলবী সাহেব [খলীফা আউয়াল (রা.)] -এর কাছে কুরআন করীমের অনুবাদ ও বুখারী শরীফ পড়ে নাও। এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে এটিও বলেছিলেন যে, কিছুটা চিকিৎসা শাস্ত্রও পড়ে নাও কেননা এটি আমাদের পারিবারিক দক্ষতা।"

তিনি (রা.) বলেন, মোটকথা এভাবেই আমার পড়াশুনা চলে আর প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে আমার অপারগতাও ছিল, কেননা শৈশবে চোখের সমস্যা ছাড়াও আমার যকৃতের সমস্যাও ছিল। আমার এমন আরো অনেক রোগ-ব্যাধি ছিল। অনেক সময় দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত আমাকে মুগ ডালের পানি বা শাক-সব্জির জুস দেওয়া হত। এই রোগগুলোর পাশাপাশি আমার প্লীহাও বেড়ে যায়। প্লীহার স্থানে রেড আয়োডাইড অফ মার্কারি মালিশ করা হত। এভাবে গলাতেও এটি মালিশ করা হত কেননা আমার গলগণ্ডের সমস্যাও ছিল। মোটকথা চোখের ইনফেকশন, যকৃতের ব্যাধি, প্রচণ্ড প্লীহা রোগ আর এর সাথে কালা জ্বরও থাকা যা কখনও কখনও ছয়মাস পর্যন্ত নামতো না। রোগ-ব্যাধির এই অবস্থা আর আমার পড়াশুনা সম্পর্কে বড়দের এই সিদ্ধান্ত দেওয়া যে, 'সে যতটুকু পড়তে চায় ততটুকু পড়ুক বেশি চাপ যেন দেওয়া না হয়'-এই অবস্থা থেকে সবাই এই অনুমান করতে পারবে যে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতার অবস্থা কি!

একবার আমাদের নানাজান হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) আমার উর্দু পরীক্ষা নিলেন। এখনও আমার হাতের লেখা ভালো নয় কিন্তু সেই সময় অর্থাৎ শৈশবে আমার হাতের লেখা এতটাই খারাপ ছিল যে, আমার হাতের লেখা পড়াই যেত না যে আমি কি লিখেছি। তিনি আমার হাতের লেখা পড়ার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু তিনি কোনভাবেই তা পড়তে পারলেন না। মীর সাহেব অনেক রাগী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। রাগান্বিত হয়ে তিনি তৎক্ষনাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট আসেন। ঘটনাক্রমে আমিও তখন ঘরেই ছিলাম। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন আমরা তো আগে থেকেই তার স্বভাবে ভয় পেতাম, তিনি তাঁর নানা ছিলেন । তিনি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট নালিশ নিয়ে এসেছেন তাই আমার আরও বেশি ভয় হলো যে, না জানি এখন কি হয়। যাইহোক মীর সাহেব এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে বললেন, "মাহমুদের পড়াশুনার প্রতি আপনার একটুও খেয়াল নেই। আমি তার উর্দু পরীক্ষা নিয়েছি। আপনি তার পরীক্ষার খাতাটি একটু দেখুন। তার হাতের লেখা এত খারাপ যে, কেউ তা পড়তে পারবে না।" এরপর এই উত্তেজিত অবস্থাতেই তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে বলতে লাগলেন "আপনি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন না আর এ দিকে ছেলের পড়াশুনার বয়স নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।" হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মীর সাহেবকে এত উত্তেজিত অবস্থায় দেখে বলেন যাও 'মৌলবী সাহেবকে ডেকে আন'। যখনই তিনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন সদা হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-কে ডেকে পাঠাতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর আমার প্রতি বিশেষ স্নেহের দৃষ্টি ছিল। তিনি আসলেন এবং রীতি অনুযায়ী মাথা নিচু করে একদিকে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বললেন, মৌলবী সাহেব! আমি আপনাকে একারণে ডেকেছি যে, মীর সাহেব বলেন, মাহমুদের হাতের লেখা পড়া যায় না। আমার ইচ্ছা হয় তার পরীক্ষা নেওয়ার। এই বলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কলম নিলেন এবং দুই তিন লাইনের একটি প্যারা লিখে আমাকে দিলেন এবং বললেন, এর অনুলিপি তৈরি কর। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই পরীক্ষাই আমার নিয়েছিলেন। আমি খুবই সাবধানতার সাথে এবং খুব ভেবেচিন্তে সেটিকে কপি করলাম। প্রথমত সেই প্যারাটি খুব দীর্ঘ ছিল না। দ্বিতীয়ত, আমার কেবল অনুলিপি করার কাজই ছিল আর অনুলিপি করা সহজতর হয়ে থাকে কেননা মূল বিষয় সামনে থাকে আর আমি তা ধীরে ধীরে কপি করি। আলিফ, বা প্রভৃতি অক্ষরগুলো সাবধানতার সাথে লিখলাম। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এটি দেখে বলেন, আমি মীর সাহেবের কথা শুনে অনেক দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম, কিন্ত তার হাতের লেখা তো আমার লেখার সাথে মিলে যায়। মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.), পূর্বেই আমার সমর্থনে বলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'মীর সাহেব এমনিতেই উত্তেজিত হয়ে গেছেন, নতুবা তার হাতের লেখা তো অনেক ভাল।' এই ছিল আমার অবস্থা। তিনি বলেন, দেখুন এ অবস্থায় আমার জাগতিকভাবে জ্ঞানার্জন কতটুকু সম্ভব ছিল!

নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি এক স্থানে বলেন ,হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আমাকে বলতেন, মিয়া তোমার স্বাস্থ্য এমন নয় যে তুমি নিজে পড়বে। আমার কাছে এসে, আমি পড়বো আর তুমি শুনবে। তিনি জোর দিয়ে প্রথমে কুরআন পড়ান আর পরে বুখারী পড়িয়ে দেন। এমন নয় যে, তিনি ধীরে ধীরে কুরআন পড়িয়েছেন। বরং তার রীতি ছিল তিনি কুরআন পড়ে অনুবাদও করে যেতেন।কোন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে বলে দিতেন, অন্যথায় দ্রুত পড়িয়ে যেতেন। তিনি (রা.) তিন মাসের মধ্যে আমাকে সম্পূর্ণ কুরআন পড়িয়ে দিয়েছিলেন। এরপর কিছুটা বিরতি তৈরি হতে থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর তিনি (রা.) পুনরায় আমাকে বলেন, মিয়া আমার কাছে বুখারী সম্পূর্ণ পড়ে নাও। তিনি (রা.) বলেন, আমি মূলত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে বলে দিয়েছিলাম যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাকে বলতেন, মৌলবী সাহেবের নিকট থেকে কুরআন এবং বুখারী পড়ে নাও। তাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর জীবদ্দশাতেই আমি তার নিকট কুরআন এবং বুখারী পড়া শুরু করে দিয়েছিলাম। যদিও মাঝে মাঝে বাদও যায়। একইভাবে আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর নির্দেশনা অনুযায়ী চিকিৎসাশাস্ত্র পড়াও তার নিকট শুরু করে দিয়েছিলাম।

যাহোক তিনি বলেন, মোটকথা আমি তার কাছ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়েছি এবং কুরআন করীমের তফসীরও। কুরআন করীমের তফসীর তিনি ২মাসের মধ্যে শেষ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে নিজের কাছে বসিয়ে নিতেন এবং কখনও অর্ধেক এবং কখনও পূর্ণাঙ্গীন পারা অনুবাদসহ পড়ে শুনাতেন। কোন কোন আয়াতের তফসীরও করে দিতেন। এভাবে তিনি দুই তিন মাসের মধ্যে বুখারী আমাকে পড়ে শেষ করে দিয়েছেন। একবার রমযান মাসে তিনি

সম্পূর্ণ কুরআনের দরস শুনিয়েছিলেন তাতেও আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। তাঁর কাছে কতিপয় আরবী পুস্তিকা পাঠেরও সৌভাগ্য হয়েছে। মোটকথা এটি ছিল আমার জাগতিক জ্ঞানের বহর।

(আল মওউদ, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৭, পৃ: ৫৩২-৫৩৭)

তাঁর প্রথম বক্তৃতা এবং এ প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন, আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন, আমি তাকে দেখেছি যে, আমি যখন দরস দিতাম তখন তিনি নিয়মিত আমার দরসে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু এর বিপরীতে আমার আরেকজন শিক্ষক ছিলেন। যখন তিনি দরস দিতেন তখন প্রথমজন মসজিদে এসে তাঁকে দরস দিতে দেখলে চলে যেতেন এবং বলতেন, এর কথা কী শুনব, এগুলো তো শোনাই আছে। কিন্তু আমি তাঁর ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি ভাল ধারণার কারণে বলতেন, আমি তার দরসে এজন্য অংশগ্রহণ করি যে, এর মাধ্যমে আমি পবিত্র কুরআনের অনেক নতুন অর্থ জানতে পারি। এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে, কোনো কোনো মানুষের প্রতি শৈশবেই এমন জ্ঞানের দরজা খুলে দেওয়া হয় যা অন্যদের চিন্তাচেতনা ও কল্পনাতেও থাকে না। আসলে বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে মুসলেহ্ মওউদ বানানোর, এজন্য নিজেই জ্ঞান দান করছিলেন। যাহোক তিনি (রা.) বলেন, এই মসজিদেই, সম্ভবত এটি মসজিদে আকসার কথা, ১৯০৭ সনে আমি সর্ব প্রথম জনসম্মুখে বক্তৃতা করি। এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় ঘটে অর্থাৎ মৃত্যুর এক বছর পূর্বের ঘটনা। উপলক্ষ্যটি ছিল জলসার আর অনেক লোক সমবেত হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন। আমি সূরা লুকমানের দ্বিতীয় রুকু পাঠ করে এর তফসীর উপস্থাপন করি। তখন আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমি যখন (বক্তৃতা দেওয়ার জন্য) দণ্ডায়মান হই, যেহেতু আমি ইতিপূর্বে কখনোই জনসম্মুখে বক্তৃতা করি নি এবং আমার বয়সও তখন কেবল ১৮ বছর ছিল আর তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এবং আঞ্জুমানের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন, এছাড়া আরো অনেক বন্ধুও এসেছিলেন এজন্য আমার চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে যায়। তখন আমার কিছুই জানা ছিল না যে, আমার সম্মুখে কে বসে আছেন আর কে নেই। বক্তৃতাটি আধা ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টার ছিল। আমি যখন বক্তৃতা শেষ করে আসন গ্রহণ করি আমার স্মরণ আছে তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, মিয়া! আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, কেননা তুমি অনেক উচ্চাঙ্গের বক্তব্য উপস্থাপন করেছ। আমি তোমাকে খুশি করার জন্য বলছি না, বরং আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলছি, আসলেই ভালো ছিল।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২২, পৃ: ৪৭২-৪৭৩)

অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এমনভাবে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছিলেন যে, তাঁর ৫২ বছরের জীবন এর সাক্ষী। হোক সেটি ধর্মীয় বা জাগতিক কোনো বিষয়, যখনই তাঁকে কোনো বিষয়ে লিখতে বা বলতে বলা হয়েছে তখন তিনি (রা.) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্রোত বইয়ে দিয়েছেন। অসংখ্যবার তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতার অ-আহমদীরাও ভূয়সী প্রশংসা করেছে আর এটি রেকর্ডেড কথা এবং প্রকাশ্যে জনসম্মুখে তাঁর প্রশংসাও করেছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও খবর প্রকাশ করেছে। এসব বিষয় থেকে সুস্পষ্ট যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে। যাহোক তাঁর লেখনী ও বিভিন্ন বক্তৃতা একটি অমূল্য ভাণ্ডার, এগুলোর হাজার হাজার পৃষ্ঠা হবে, বরং বলা উচিত সম্ভবত লক্ষ পৃষ্ঠার কাছাকাছি হবে। এখন এগুলো ইংরিজি ভাষায় এবং অন্যান্য ভাষায়ও অনূদিত হচ্ছে। আমাদেরও দায়িত্ব এগুলো থেকে লাভবান হওয়া।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজেকে মুসলেহ্ মওউদ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নকারী বা সত্যায়নস্থল সব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও তাঁর দয়ায় সেই ভবিষ্যদ্বাণী যার পূর্ণতার জন্য অনেক দিন যাবৎ অপেক্ষা করা হচ্ছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ইলহাম ও বিভিন্ন আভাসের মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি আমার সত্তায় পূর্ণ হয়েছে। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা এখন ইসলামের শত্রুদের নিকট হুজ্জত পূর্ণ করে দিয়েছেন আর তাদের কাছে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইসলাম হল আল্লাহ্ তা'লার সত্য ধর্ম, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্‌র সত্য রসূল এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার সত্য নবী। তারা মিথ্যাবাদী যারা ইসলামকে মিথ্যা বলে। মিথ্যুক হলো তারা যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে মিথ্যুক বলে। আল্লাহ্ তা'লা এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

কার সাধ্য ছিল যে, ১৮৮৬ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে পুরো ৫৮ বছর পূর্বে [তিনি (রা.) যখন বর্ণনা করছিলেন তখন ৫৮ বছর হয়ে গিয়েছিল] নিজের পক্ষ থেকে এই সংবাদ দেওয়ার যে, ৯ বছরের মধ্যে তার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে দ্রুত বড় হবে, সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে, সে ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর নাম পৃথিবীতে প্রচার করবে, তাকে বাহ্যিক ও ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে, সে মহাপ্রতাপান্বিত খোদার ঐশী বিকাশের কারণ হবে এবং সে আল্লাহ্ তা'লার মহিমা, নৈকট্য ও অনুগ্রহের এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত হবে। এই সংবাদ পৃথিবীর কোন ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে প্রদান করতে পারে না! স্বয়ং খোদা এই সংবাদ প্রদান করেছেন এবং সেই খোদা-ই সেটিকে পূর্ণ করেছেন। সেই মানুষটির মাধ্যমে তা পূর্ণ করেছেন যার সম্বন্ধে ডাক্তারের এই প্রত্যাশা ছিল না যে, সে জীবিত থাকবে অথবা দীর্ঘায়ু লাভ করবে।

অতঃপর তিনি (রা.) নিজের স্বাস্থ্যের বিষয়ে বলেন, "শৈশবে আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, একবার ডাক্তার মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব (রা.) আমার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -কে বলেন, এর ক্ষয়রোগ হয়েছে, তাই তাকে কোন পাহাড়ি অঞ্চলে পাঠানো হোক, অর্থাৎ যক্ষা রোগের কারণে। কাজেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে শিমলা পাঠিয়ে দেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি উদাস হয়ে যাই আর তাই দ্রুত ফিরে আসি। মোটকথা এমন ব্যক্তি যার স্বাস্থ্য একদিনের জন্যও ভাল ছিল না, সেই ব্যক্তিকে খোদা তা'লা জীবিত রেখেছেন আর একারণে জীবিত রেখেছেন যে, তার মাধ্যমে স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করবেন এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের সত্যতার প্রমাণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করবেন। এছাড়া আমি সেই ব্যক্তি ছিলাম যার কোন জাগতিক জ্ঞান ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমার শিক্ষদীক্ষার জন্য ফিরিশতাদের প্রেরণ করেন এবং আমাকে কুরআনের সেই সমস্ত জ্ঞান দান করেন যা কোন মানুষ ধারণা কিংবা কল্পনাও করতে পারত না। সেই জ্ঞান যা খোদা আমাকে দান করেছেন, সেই আধ্যাত্মিক ঝর্ণাধারা যা আমার বক্ষে প্রস্ফুটিত, তা কোন কাল্পনিক কিংবা আনুমানিক বিষয় নয়, বরং এটি অকাট্য ও সুনিশ্চিত বিষয়। আমি সমগ্র পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করছি, এই ধরাপৃষ্ঠে যদি এমন কোন ব্যক্তি এই দাবি করে যে, তাকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কুরআন শিখানো হয়েছে তাহলে আমি সর্বদা তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমার মোকাবিলা করতে কেউ-ই আসে নি। অথচ আমি জানি, ধরাপৃষ্ঠে আজ আমি ছাড়া আর কেউ নেই যাকে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনের জ্ঞান দান করা হয়েছে।

আল্লাহ্ আমাকে কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং বর্তমানে তিনিই আমাকে কুরআন শিখানোর জন্য জগদ্বাসীর শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই উদ্দেশ্যে দাঁড় করিয়েছেন যেন আমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) ও পবিত্র কুরআনের নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিই এবং ইসলামের বিপরীতে জগতে বিদ্যমান সকল মিথ্যা ধর্মকে পরাজিত করি।"

বাস্তবে তিনি (রা.) এ কাজ করে দেখিয়েছেন। তাঁর যুগে অগণিত ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অগণিত নয় যথেষ্ট পরিমাণে কাজ হয়েছে আর সেই কাজকেই এখন আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাঁর জীবদ্দশায় ১৭-১৮টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে তাঁর জীবদ্দশায় ইসলামের প্রচার পৃথিবীর সকল প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

তিনি (রা.) বলেন, "পৃথিবী সর্বশক্তি প্রয়োগ করুক। তারা তাদের সমস্ত শক্তি ও জনবল একত্রিত করুক আর খ্রিষ্টান বাদশাহরা ও তাদের সকল রাজত্ব সমবেত হোক, এছাড়া ইউরোপ এবং আমেরিকাও যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় আর পৃথিবীর সকল বড় সম্পশালী পরাশক্তিগুলোও যদি এক হয়ে যায় আর আমাকে এই উদ্দেশ্যে ব্যর্থ করতে একতাবদ্ধ হয়ে যায় তবুও আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, তারা আমার বিরুদ্ধে ব্যর্থমনোরথ হবে। খোদা আমার সকল দোয়া এবং পরিকল্পনার বিপরীতে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র, কুটচাল ও প্রতারণাকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। এছাড়া খোদা আমার মাধ্যমে অথবা আমার শিষ্য এবং অনুসারীদের মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণের জন্য মহানবী (সা.)-এর নামের কল্যাণ ও বদৌলতে ইসলাম ধর্মের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আর তারা সেই সময় পর্যন্ত পৃথিবীবাসীকে অবকাশ দেবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলাম পুনরায় নিজ পূর্ণ মহিমার সাথে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আবারো জগতের জীবন্ত নবী হিসেবে গ্রহণ করা হয়।"

(আল মওউদ, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৭, পৃ: ৬১৩-৬১৪)

অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী তো পূর্ণ হয়েছে এবং তিনি (রা.) তাঁর যুগও অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথাগুলো আজ অবধি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আর ইনশাআল্লাহ্ সেই সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং চলমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশন পূর্ণ হয় আর ইসলামের পতাকা সমগ্র বিশ্বে উড্ডীন হয়। অতএব আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী উপলক্ষে আমাদের বিভিন্ন সভা-সমাবেশ এবং একে স্মরণ রাখা তখনই উপকারী সাব্যস্ত হবে যখন আমরা এ উদ্দেশ্যকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখব, অর্থাৎ আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যদাকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এছাড়া বিশ্ববাসীর নিকট ইসলামের সত্যতা তুলে ধরে সবাইকে মহানবী (সা.) -এর পতাকা তলে সমবেত করতে হবে। বর্তমানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীরা ছাড়া আর কেউ নেই যাদের মাধ্যমে ইসলামের পতাকা পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে উড্ডীন হবে এবং জগৎময় ইসলাম বিস্তার লাভ করবে। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে এই কাজ করার তৌফিক দান করুন।

****

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্ তা'লা আপনার ওপর দু'টি মৃত্যু একত্রিত করবেন না। আপনার মৃত্যুতে পৃথিবীর এমন ক্ষতি হয়েছে যা কোন নবীর মৃত্যুতে হয়নি। আপনার সত্তা বর্ণনার উর্ধ্বে এবং আপনার মর্যাদা এমন যে, কোন শোক আপনার বিচ্ছেদের কষ্ট কমাতে পারে না। আপনার মৃত্যু ঠেকানোর ক্ষমতা যদি আমাদের থাকত তাহলে আমরা সবাই আমাদের প্রাণের বিনিময়ে আপনার মৃত্যু থামাতাম।

আবু বাকার ছাড়া অন্য কেউ নামায পড়াক তা আল্লাহ্ ও মুসলমানেরা অপছন্দ করে। (আল হাদীস)

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

"এই উম্মতের প্রতি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কত বড় অনুগ্রহ রয়েছে! যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা সাধ্যাতীত। তিনি যদি সকল সাহাবী (রা.)-কে মসজিদে নববীতে একত্রিত করে এই আয়াত না শুনাতেন যে, পূর্বের সকল নবী মৃত্যু বরণ করেছেন তাহলে এই উম্মত ধ্বংস হয়ে যেত। [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

আমাদের মধ্য থেকে আমীর হবে আর তোমরা হবে সাহায্যকারী। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমাদের নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমাদের পরামর্শ ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না।

পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আহমদীদেরকে দোয়ার প্রতি আহ্বান।

আল্লাহ্ করুন, এরা যেন আল্লাহ্‌কে চিনতে পারে এবং নিজেদের জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যেন মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে।

মাননীয় খুশি মহম্মদ সাহেব শাকির (মুরুব্বি সিলসিলা)-এর মৃত্যু সংবাদ ও তাঁর স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত** ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (২৫ তবলীগ, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল, এতে বিদায় হজ্জের একটি ঘটনার কথা এভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, দশম হিজরী সনের যুলকাদাহ্ মাসের ছয়দিন বাকি থাকতেই মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। একটি ভাষ্য অনুসারে তিনি শনিবার দিন যাত্রা করেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬১, বাব হাজ্জাতুল বিদা)

যাহোক, এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যাতে হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন বিদায় হজ্জের সংকল্প করেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার কাছে একটি উট আছে। (আপনি অনুমতি দিলে) এর পিঠে আমরা আমাদের পাথেয় তুলে নিই। মহানবী (সা.) বলেন, (ঠিক আছে) এমনটিই কর। কাজেই, মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) উভয়ের মালপত্রের জন্য একটিই উট ছিল। তিনি (সা.) পাথেয় হিসেবে কিছু আটা ও ছাতু নেন আর (তা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর উটের পিঠে তুলে দেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সেটি (অর্থাৎ উটটি) তাঁর ভৃত্যের দায়িত্বে দিয়ে দেন।

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হই। আমরা যখন আরশ নামক স্থানে ছিলাম তখন মহানবী (সা.) বাহন থেকে নামেন আর আমরাও নামি। এরপর হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর একপাশে বসেন আর আমি আমার পিতার পাশে বসে পড়ি। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মালপত্র একত্রে একটি উটের পিঠে রাখা ছিল। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সেটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর ভৃত্যের কাছে ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) তার আসার অপেক্ষায় ছিলেন। (কিছুক্ষণ পর) সেই ভৃত্য এলেও উটটি তার সাথে ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমার উট কোথায়? সে বলে, গত রাতে আমি সেটি হারিয়ে ফেলেছি। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, একটিমাত্র উট ছিল, তা-ও তুমি হারিয়ে ফেলেছ? এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে প্রহার করতে উদ্যত হন আর তখন মহানবী (সা.) মুচকি হেসে বলেন, এই এহরাম বাঁধা ব্যক্তি কী করে দেখ! ইবনে আবি রিযমা বলেন, মহানবী (সা.) এই এহরাম বাঁধা ব্যক্তিকে দেখ-বলা ছাড়া আর বেশি কিছু বলেন নি আর তিনি মুচকি হাসতে থাকেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১২-১৩) (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক,বাবুল মুহরিম, হাদীস-১৮১৮)

যাই হোক, কোন কোন সাহাবী যখন জানতে পারেন, মহানবী (সা.)-এর পাথেয় বা রসদপত্র হারিয়ে গেছে তখন তারা হীস নিয়ে আসেন (হীস হচ্ছে এক ধরনের উন্নত হালুয়া যা খেজুর, আটা এবং মাখন দিয়ে প্রস্তুত করা হয়) আর তা মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে উপস্থাপন করেন। হযরত আবু বকর (রা.), যিনি তাঁর ভৃত্যের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন, মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে আবু বকর! নম্রতা অবলম্বন কর। এ বিষয়টি তোমার হাতেও নেই আর আমাদের হাতেও না। এই ভৃত্য নিশ্চয় চেষ্টা করেছে,যাতে উটটি না হারায়, কিন্তু (তারপরও) হারিয়ে গেছে। যাহোক, তিনি (সা.) বলেন, এগুলো নাও, আমাদের জন্য এই পবিত্র খাবার এসেছে যা আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন আর এই ভৃত্যের সাথে আমাদের যে খাবার ছিল তা এর বিনিময়স্বরূপ। এরপর মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)ও সেই খাবার খান এবং তারাও খান যারা তাঁদের উভয়ের সাথে আহার করতেন; এমনকি তারা সবাই পরিতৃপ্ত হন। এরপর হযরত সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল (সেখানে) পৌঁছেন। তার দায়িত্ব ছিল কাফেলার পেছনে আসা। যেমনটি ইফ্‌কের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে, তার দায়িত্ব ছিল (কাফেলার) পেছনে কোন জিনিস পড়ে আছে কিনা তা দেখা। হযরত সাফওয়ান (রা.) যখন আসেন তার সাথে উট ছিল আর এর পিঠে পাথেয়ও রাখা ছিল। উটকে তিনি মহানবী (সা.)-এর তাবুর দরজায় এনে বসান। তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, দেখ! তোমার জিনিসপত্রের মধ্য থেকে কিছু হারিয়ে যায় নি তো? হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আমাদের পানি পান করার পেয়ালাটি ব্যতীত অন্য কিছুই হারায় নি। তখনই সেইভৃত্য বলে, ওই পেয়ালাটি আমার কাছে আছে।

(আস সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৫) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১১০)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) রেওয়ায়েত করেন যে, বিদায় হজ্জের সময় তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হন এবং তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.)ও ছিলেন। তারা যুল হুলায়ফায় পৌঁছেন সেখানে হযরত আসমার (রা.) গর্ভে মুহাম্মদ বিন আবু বকরের জন্ম হয়। যুল হুলায়ফা মদিনা থেকে ছয়-সাত মাইল দূরের একটি স্থান। যাহোক হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে তাঁকে সন্তান জন্মের সংবাদ দেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আসমাকে বল, সে যেন গোসল করে হজ্জের এহরাম বেঁধে নেয় এবং সেসব কাজ করে যা অন্যরা, অর্থাৎ হাজীরা করে; কিন্তু সে যেন কা'বা শরীফের তাওয়াফ না করে।

(সুনানুন নিসাঈ, কিতাবু মানাসিকিল হজ্জ) (মুজামুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন উসফান উপত্যকা অতিক্রম করেন তখন তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আবু বকর! এটি কোন উপত্যকা? আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, এটি উসফান উপত্যকা। তখন তিনি (সা.) বলেন, হযরত হুদ (আ.) এবং হযরত সালেহ্ (আ.) খেজুরের বাকলের লাগাম পরানো দুটি লাল উটে আরোহন করে আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায়, সাদা ও কালো নকশা করা চাদর জড়িয়ে তালবিয়া বলতে বলতে 'বায়তুল আতীক'-এর হজ্জের উদ্দেশ্যে এ পথ ধরে গিয়েছিলেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৬১)

বিদায় হজ্জের সফরে যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তাদের মাঝে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ও ছিলেন। (আস সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৯)

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি বিদায় হজ্জের সময় দেখি, সুহায়েল বিন আমর কুরবানীর পশু জবাইয়ের স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কুরবানীর পশুকে তাঁর নিকটবর্তী করে দিচ্ছেন। মহানবী (সা.) নিজ হাতে এটি জবাই করেন আর এরপর চুল কামানোর দায়িত্বে নিযুক্ত লোককে চুল কামাতে ডাকেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি সুহায়েলকে দেখি, সে নিজের চোখে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র কেশ স্পর্শ করছিল। তিনি (রা.) বলেন, তখন আমার মনে পড়ে এই সুহায়েলই হুদায়বিয়ার সময় মহানবী (সা.)-কে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতে বাধা দিয়েছিল; যা সন্ধিতে লেখার কথা ছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করি যিনি সুহায়েলকে ইসলামের পানে হেদায়েত দিয়েছেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬৪) আর হেদায়েত দেওয়ার পর তিনি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় সীমাহীন উন্নতি করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর অন্তিম শয্যায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নামায পড়ানোর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর অসুস্থতার সময় বলেন, আবু বকরকে নামায পড়াতে বল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হযরত আবু বকর (রা.) যখন আপনার স্থলে (নামায পড়াতে) দাঁড়াবেন তখন কান্নার কারণে তিনি তিলাওয়াত করতে পারবেন না। তাই আপনি হযরত উমর (রা.)-কে নামায পড়াতে বলুন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,এরপর আমি হযরত হাফসা (রা.)-কে বলি, মহানবী (সা.)-কে আপনি বলুন যে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন আপনার জায়গায়দঁ াড়াবেন তখন কান্নার কারণে লোকদের তিনি শোনাতে পারবেন না। তাই আপনি হযরত উমর (রা.)-কে বলে দিন, তিনি যেন নামায পড়ান। হযরত হাফসা (রা.) তা-ই করেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, চুপ কর। তোমরা তো দেখছি ইউসুফের মহিলাদের মতো (করছ)। আবু বকরকে বল, সে-ই যেন লোকদের নামায পড়ায়। (সহী বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৬৭৯)

মৃত্যুর পূর্বে মহানবী (সা.) যখন অসুস্থ ছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে হযরত বিলাল (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে নামায পড়াতে বলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) কক্ষ থেকে হযরত উমর (রা.)-এর আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলেন, আবু বকর কোথায়? আল্লাহ্ এবং মুসলমানরা আবু বকর ছাড়া অন্য কারো নামায পড়ানো পছন্দ করে না। তখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে ডেকে পাঠানো হলে তিনি (রা.) তখন এসে পৌঁছেন যখন হযরত উমর (রা.) ইতিমধ্যেই নামায পড়িয়ে শেষ করেছেন। এরপর থেকে মহানবী (সা.)-এর অসুস্থতাকালীন সময় এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.)-ই নামায পড়াতে থাকেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৬-৯৭)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) নিজের অসুস্থতার সময় হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামায পড়ানের নির্দেশ প্রদান করেন, তাই তিনি (রা.) তাদের নামায পড়াতেন। উরওয়া (রা.) বলতেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর অসুস্থতায় কিছুটা আরাম বোধ করলে (কক্ষ থেকে) বেরিয়ে মসজিদে আসেন। এসে দেখেন, হযরত আবু বকর (রা.) নামাযে লোকদের ইমামতি করছেন। হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-কে দেখে পিছনে সরে আসেন। এটি দেখে মহানবী (সা.) তাকে ইঙ্গিতে স্বস্থানেই অবস্থান করতে বলেন আর তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমান্তরালে তার পাশেই বসে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নামাযের সাথে নামায পড়েন আর লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-এর নামাযের সাথে নামায পড়ে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৬৮৩)

এটিও বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত। অনুরূপভাবে বুখারী শরীফেরই আরো একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আনাস বিন মালেক আনসারী (রা.) রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.) যে অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেন সেই অসুস্থতার সময় হযরত আবু বকর (রা.) লোকদের নামায পড়াতেন। এভাবে যখন সোমবার আসে আর তিনি (রা.) নামাযের সারিতে (দাঁড়িয়ে) ছিলেন তখন মহানবী (সা.) কামরার পর্দা সরান। মহানবী (সা.) দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন আর আমাদের দেখছিলেন। মহানবী (সা.) -এর পবিত্র চেহারা যেন কুরআন শরীফের পৃষ্ঠার মতো দেখাচ্ছিল।

এরপর মহানবী (সা.) খুশি হয়ে মৃদু হাসেন আর আমাদের মনে হয়, মহানবী (সা.)-কে দেখার ফলে আনন্দে আমরা পরীক্ষায় পড়ে যাব। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) পিছনের সারিতে যুক্ত হওয়ার জন্য পিছনে চলে আসেন আর তিনি (রা.) ধারণা করেন, মহানবী (সা.) নামাযের জন্য (হুজরা থেকে) বাইরে আসছেন। কিন্তু মহানবী (সা.) ইঙ্গিতে বলেন, নামায পূর্ণ কর এবং এরপর পর্দা টেনে দেন আর সেই দিনই তিনি (সা.) মৃত্যুবরণ করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৬৮০)

প্রথম রেওয়ায়েত সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) যখন মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত তখন মারাত্মক দুর্বলতার কারণে তিনি নামায পড়াতে সক্ষম ছিলেন না, তাই তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন নামায পড়ানো শুরু করেন তখন তিনি (সা.) কিছুটা সুস্থ বোধ করেন এবং নামাযের জন্য বের হন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেওয়ার পর নামায শরু হয়ে গেলে তিনি (সা.) কিছুটা সুস্থ বোধ করেন। অতএব তিনি (সা.) দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে বের হন। তিনি (রা.) বলেন, এখনও আমার দৃষ্টিপটে সেই দৃশ্য ভাসছে। অর্থাৎ ব্যথার তীব্রতার কারণে মহানবী (সা.)-এর পা মাটিতে ছেঁচড়াচ্ছিল। মহানবী (সা.)-কে দেখে হযরত আবু বকর (রা.) পিছনে সরে আসার ইচ্ছা করেন। এই ইচ্ছা সম্পর্কে বুঝতে পেরে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবু বকর (রা.)-কে ইশারায় বলেন, নিজের জায়গাতেই থাক। এরপর মহানবী (সা.)-কে সেখানে আনা হয় এবং তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর পাশে বসে পড়েন। এরপর মহানবী (সা.) নামায পড়া আরম্ভ করেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর অনুকরণে নামায পড়তে থাকেন আর অন্যরা হযরত আবু বকর (রা.)-এর নামাযের অনুসরণ করতে থাকে। "

[সীরাতুন নবী (সা.), আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০৬-৫০৭]

মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকাল সম্পর্কে এক স্থানে হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) সুনা'য় ছিলেন,অর্থাৎ শহরতলীর একটি গ্রাম সুনা'য় ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু সংবাদ যখন পৌঁছে তখন উক্ত সংবাদ শুনে হযরত উমর (রা.) দঁ াড়িয়ে যান। তখন হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে ছিলেন না হযরত উমর সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দঁাড়িয়ে যান এবং বলেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যু বরণ করেন নি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) বলতেন, আল্লাহ্র কসম আমার হৃদয়ে এ ভাবনারই উদয় হয় যে, আল্লাহ্ অবশ্যই কতক মানুষের হাত পা কাটার জন্য তাঁকে উত্থিত করবেন। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর (রা.) এসে পড়েন এবং তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে তাঁকে চুম্বন করেন এবং বলেন, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসগীত। আপনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় পূত-পবিত্র। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ আপনাকে কখনো দুটি মৃত্যর স্বাদ গ্রহণ করাবেন না। একথা বলে হযরত আবু বকর (রা.) বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বলেন, হে শপথকারী! থাম। অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, ক্ষান্ত হও। হযরত আবু বকর (রা.) যখন কথা বলা আরম্ভ করেন তখন হযরত উমর (রা.) বসে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহ্র প্রশংসা-কীর্তন করে বলেন,

أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ -

অর্থাৎ, দেখ! যে মুহাম্মদের উপাসনা করতো সে জেনে নিক নিশ্চয় মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। আর যে আল্লাহ্র উপাসনা করতো সে জেনে নিক, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মরবেন না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এই আয়াত পাঠ করেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ (সূরা যুমার: ৩১) অর্থাৎ তুমিও মরণশীল আর তারাও মরণশীল এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَائِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللهُ الشّٰكِرِيْنَ (آل عمران:145)

(সূরা আলে ইমরান: ১৪৫) অর্থাৎ মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ কিছু নন। তাঁর পূর্বের সমস্ত রসূল মৃত্যু বরণ করেছেন। তাহলে তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন তবে কি তোমরা তোমাদের গোড়ালিতে ফিরে যাবে (অর্থাৎ, পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে)? আর যে-ই নিজ গোড়ালিতে ফিরে যাবে সে কখনোই আল্লাহ্র কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না আর অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে মানুষ এত কাঁদে যে, তাদের হেঁচকি উঠে যায়।

[সহী বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলু আসহাবিন নবী (সা.) হাদীস-৩৬৬৭৩৬৬৭]

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্র কসম! মনে হচ্ছিল, হযরত আবু বকর (রা.)-এর উক্ত আয়াত পাঠ করার পূর্বে মানুষ যেন জানতো-ই না যে, আল্লাহ্ এই আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন। সবাই যেন হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে এই আয়াত শিখেছে। অতঃপর আমি যে ব্যক্তিকেই পেয়েছি তাকে উক্ত আয়াত পাঠ করতে শুনেছি। বর্ণনাকারী বলেন, সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব আমাকে বলেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি হযরত আবু বকর (রা.)-কে উক্ত আয়াত পাঠ করতে শুনা মাত্র এতটা শঙ্কিত হই যে, ভয়ে আমার পা আমার দেহের ভার বহনে অক্ষম হয়ে পড়ে আর আমি মাটিতে পড়ে যাই। আবু বকরকে এ আয়াত পড়তে শুনে আমি নিশ্চিৎ হয়ে যাই যে, মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৪৫৪)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তখন তিনি বলছিলেন যে, মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন নি এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ইন্তেকাল করবেন না যতক্ষণ আল্লাহ্তা'লা মুনাফিকদের পূর্ণরূপে হত্যা না করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর

(রা.) বলেন, তারা অর্থাৎ সাহাবীরা একথা শুনে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং নিজেদের মাথা উঁচিয়ে তাকান। এমন সময় হযরত আবু বকর বলেন, হে ভদ্র মানুষ, রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিশ্চয় মৃত্যুবরণ করেছেন! [অর্থাৎ হযরত উমরকে সম্বোধন করে বলেন যে, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন।] তুমি কি শোন নি যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (সূরা যুমার: ৩১) অর্থাৎ তুমিও মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে; আর এ-ও বলেছেন- وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ (সূরা আম্বিয়া: ৩৫) অর্থাৎ আর আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দান করি নি? এরপর হযরত আবু বকর মিম্বরে উঠেন এবং ভাষণ প্রদান করেন। যাহোক, এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আবু আব্দুল্লাহ্ কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, এই ঘটনাটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সাহসিকতার অনেক বড় প্রমাণ, কারণ সাহসিকতার চরমত্ব হলো বিপদাপদ আপতিত হবার সময় মনোবল দৃঢ় থাকা; আর মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর বিপদের চেয়ে বড় কোন বিপদ সে সময় মুসলমানদের জন্য ছিল না। অতএব সেই (কঠিন) মুহূর্তে তার বীরত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে। (আল মোয়াহিবুললাদানিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৪৭)

দু'টোই প্রকাশ পেয়েছে; বীরত্বও প্রকাশ পেয়েছে যে, শোকের ধাক্কা সামলে উঠেছেন, আর কুরআন শরীফের আয়াতের যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাথেকে পাণ্ডিত্যও প্রকাশ পেয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন ,হাদীস ও ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীতে এই রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ আছে যে, সাহাবীদের ওপর মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, তারা ঘাবড়ে যান; কয়েকজন তো বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং কয়েকজন চলৎশক্তি হারিয়ে বসে।কতক নিজেদের বোধ-বুদ্ধির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং কতকের ওপর এই শোকের এত গভীর প্রভাব পড়ে যে,কয়েকদিনের ভেতর শোকে তাদের অস্তিত্ব মিটে যায়। হযরত উমরের ওপর এই শোকের এমন আঘাত আসে যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ বিশ্বাসই করতে পারেন নি এবং তিনি তরবারি হাতে উঠে দাঁড়ান ও বলেন, যদি কেউ একথা বলে যে,রসূলে করীম (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন- তবে আমি তাকে হত্যা করব! তাঁকে মূসা (আ.)-এর মতো ডেকে পাঠানো হয়েছে; তিনি যেভাবে চল্লিশ দিন পর ফিরে এসেছিলেন, তেমনিভাবে তিনি (সা.)-ও কিছুদিন পর ফিরে আসবেন এবং তাঁর (সা.) নামে অপবাদ রটনাকারী ও মুনাফিকদের হত্যা করবেন আর ক্রুশে ঝুলাবেন। তিনি এতটা উত্তেজনার সাথে এই দাবিতে অনড় ছিলেন যে, তার এই কথার খণ্ডন করা সাহাবীদের কারো সাধ্যে কুলোয় নি। হযরত উমরের এই উত্তেজনা দেখে কারো কারো বিশ্বাস জন্মে যে,এটি-ই সঠিক কথা, মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করেন নি; আর তাদের চেহারায় আনন্দের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। মুহূর্তপূর্বে তারা নতশিরে বসে ছিলেন, আর এখন আনন্দে মাথা তুলছেন। এই পরিস্থিতি দেখে কয়েকজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাহাবী মিলে একজন সাহাবীকে রওয়ানা করেন যেন তিনি গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-কে দ্রুত নিয়ে আসেন, যিনি মাঝে মহানবী (সা.)-এর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় তাঁর (সা.) অনুমতি নিয়ে মদিনার পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে গিয়েছিলেন। যাহোক, রওয়ানা হতেই তিনি হযরত আবু বকরের দেখা পেয়ে যান; [তিনি (রা.) ফিরে আসছিলেন;] তাকে দেখেই সেই সাহাবীর চোখ থেকে অশ্রু ঝরা আরম্ভ হয়ে যায়, যিনি সাহাবীদের পক্ষ থেকে সংবাদ দিতে যাচ্ছিলেন; তিনি কান্নার আবেগ আর সামলাতে পারেন নি। হযরত আবু বকর ঘটনা বুঝে ফেলেন এবং সেই সাহাবীকে জিজ্ঞেস করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কি মৃত্যু বরণ করেছেন? তিনি উত্তর দেন, হযরত উমর বলছেন, যে ব্যক্তি বলবে রসূলে করীম (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন- আমি তরবারি দিয়ে তার শিরোচ্ছেদ করব। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে যান। তাঁর (সা.) পবিত্র দেহের ওপর যে চাদরটি ছিল তা সরিয়ে দেখেন এবং নিশ্চিত হন যে, তিনি (সা.) সত্য সত্যই মৃত্যু বরণ করেছেন। নিজ প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদের শোকে তার অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে এবং হযরত আবু বকর (রা.) নীচে ঝুঁকে তাঁর (সা.) ললাট চুম্বন করেন ও বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্ তা'লা আপনার ওপর দু'টি মৃত্যু একত্রিত করবেন না। আপনার মৃত্যুতে পৃথিবীর এমন ক্ষতি হয়েছে যা কোন নবীর মৃত্যুতে হয়নি। আপনার সত্তা বর্ণনার ঊর্ধ্বে এবং আপনার মর্যাদা এমন যে, কোন শোক আপনার বিচ্ছেদের কষ্ট কমাতে পারে না। আপনার মৃত্যু ঠেকানোর ক্ষমতা যদি আমাদের থাকত তাহলে আমরা সবাই আমাদের প্রাণের বিনিময়ে আপনার মৃত্যু থামাতাম।

একথা বলে তিনি আবার তার গায়ে কাপড় জড়িয়ে দেন এবং সেখানে আসেন যেখানে হযরত উমর (রা.) সাহাবীদের মাঝে বসেছিলেন এবং লোকদের বলছিলেন যে, মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করেন নি, বরং জীবিত আছেন। তিনি সেখানে এসে হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আপনি একটু চুপ থাকুন। কিন্তু তিনি তার কথা মানেন নি আর নিজের কথা অব্যাহত রাখেন । এতে হযরত আবু বকর (রা.) একপাশে সরে গিয়ে লোকদের বলেন, মহানবী (সা.) আসলে ইন্তেকাল করেছেন। সাহাবীগণ হযরত উমর (রা.)-কে ছেড়ে তাঁর চারপাশে সমবেত হন। আর অবশেষে হযরত উমর (রা.)-কেও তাঁর কথা শুনতে হয়। যেমনটি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন,

'وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَائِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ-

(সূরা আলে ইমরান: ১৪৫)

অর্থাৎ, আর মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তাঁর পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই মারা গেছেন। অতএব তিনি যদি মৃত্যু বরণ করেন অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা তোমাদের গোড়ালিতে ফিরে যাবে? তুমিও অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবে আর তারাও মৃত্যু বরণ করবে। হে লোক সকল! যে মু হাম্মদ (সা.)-এর উপাসনা করতো সে শুনে নিক যে, মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন। আর যে আল্লাহ তা'লার উপাসনা করতো সে স্মরণ রাখুক, আল্লাহ্ জীবিত, তিনি মৃত্যু বরণ করেন না। হযরত আবু বকর (রা.) যখন উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করে লোকদের বলেন যে, মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন তখন সাহাবীদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়; আর তারা অসহায়ের ন্যায় কাঁদতে থাকে। হযরত উমর (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন কুরআনের আয়াত দ্বারা তাঁর (সা.) মৃত্যু সাব্যস্ত করেন তখন আমার মনে হলো যেন, এই আয়াত দুটি আজই অবতীর্ণ হয়েছে। আর আমার হাঁটু আমার দেহভার বহন করার শক্তি হারিয়ে বসে। আমার পা দোদুল্যমান হতে থাকে। আর আমি দুঃখের আতিশয্যে মাটিতে পড়ে যাই। (দাওয়াতুল আমীর, আনোয়ারুল উলুম, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৫-৩৪৭)

এ প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের প্রথম ইজমা বা ঐকমত্য সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এর পূর্বের সকল রসূল মৃত্যু বরণ করেছেন যাদের মধ্যে মসীহ্ (আ.)ও অন্তর্ভুক্ত। অতএব মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে যখন সকল মুসলমান আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং এ ধাক্কা তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠে, তখন হযরত উমর (রা.) একই আতঙ্কে তরবারি বের করেন এবং বলেন, কেউ যদি বলে মহানবী (সা.) মারা গেছেন, আমি তার ঘাড় কেটে দেব। মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করেন নি, বরং হযরত মূসা (আ.)-এর মতো খোদা তা'লার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন, তিনি পুনরায় ফিরে আসবেন এবং মুনাফিকদের নির্মূল করবেন, তারপর তিনি মারা যাবেন। তাঁর বিশ্বাস যেন এটি ছিল যে, মুনাফিকরা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করতে পারেন না। আর যেহেতু মুনাফিকরা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তাই তিনি ধরে নিয়েছেন যে, তিনি মৃত্যু বরণ করেন নি। হযরত আবু বকর (রা.) তখন মক্কার বাইরের একটি গ্রামে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে আসেন আর মহানবী (সা.) এর বাড়িতে যান। মহানবী (সা.) এর বরকতময় দেহ দেখেন। তিনি সত্যিই মারা গিয়েছেন কি-না তা নিশ্চিত হন। এরপর তিনি বাইরে বের হন এবং বলতে থাকেন যে, আল্লাহ্ তা'লা মহনবী (সা.) কে দুটি মৃত্যু দিবেন না। অর্থাৎ একটি দৈহিক মৃত্যুএবং অন্যটি আধ্যাত্মিক মৃত্যু, যার কারণে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মুসলমানদের বিকৃত হওয়ার অশঙ্কা দেখা দেবে। অতঃপর তিনি সোজা সাহাবীদের সমাবেশে যান এবং সকলের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আমি কিছু বলতে চাই। হযরত উমর (রা.) তরবারি হাতে দণ্ডায়মান ছিলেন আর এই সংকল্প নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, যদি কেউ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর ঘোষণা করে তাহলে আমি তাকে হত্যা করব। হযরত আবু বকর (রা.) দণ্ডায়মান হন আর তিনি মানুষকে সম্বোধন করে সেই কথাই বলেন। অর্থাৎ 'مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ -' । অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইবাদত করতো সে শুনে নিক যে, মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করতো সে আনন্দিত হোক, কেননা আল্লাহ্ তা'লা জীবিত আর কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না।

অতঃপর যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন যে, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ (সূরা আলে ইমরান: ১৪৫) অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার রসূল ছিলেন আর তাঁর পূর্বে যত রসূল অতিবাহিত হয়েছেন সবাই মৃত্যু বরণ করেছেন। তাহলে তিনি কেন মৃত্যু বরণ করবেন না? তিনি যদি মৃত্যু বরণ করেন অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা তোমাদের গোড়ালিতে ফিরে যাবে আর ইসলাম পরিত্যাগ করবে? হযরত উমর বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন তখন আমার চোখ খুলে যায় আর আমার এমন মনে হচ্ছিল যেন এই আয়াত এখনই অবতীর্ণ হয়েছে। আর আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন আর আমার পা কেঁপে উঠে এবং আমি মাটিতে পড়ে যাই। এ কথা বর্ণনা করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সাহাবীদের এটি একমাত্র ইজমা ছিল কেননা তখন সমস্ত সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। আর প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জীবনে এর পূর্বে কখনো এরূপ মুহূর্ত আসে নি, কেননা আর কখনো মুসলমানরা এভাবে একত্রিত হয় নি। এই ইজতেমায় হযরত আবু বকর (রা.) এই আয়াত পাঠ করেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) কেবল আল্লাহ্ তা'লার একজন রসূল আর তাঁর পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার যত রসূল এসেছেন তারা সবাই মৃত্যু বরণ করেছেন। অতএব তাঁর মৃত্যু বরণ করাও কোন অসম্ভব বিষয় নয় আর সমস্ত সাহাবী তারঁ সাথে সহমত পোষণ করেন।

(মাসলায়ে ওহী ও নবুয়্যত কে মুতাল্লিক ইসলামি নাযরিয়া, আনোয়ারুল উলুম, ২৩তম খণ্ড, পৃ:: ৩২৭-৩২৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও হযরত আবু বকর (রা.) এর বরাতে এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"এই উম্মতের প্রতি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কত বড় অনুগ্রহ রয়েছে! যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা সাধ্যাতীত। তিনি যদি সকল সাহাবী (রা.)-কে মসজিদে নববীতে একত্রিত করে এই আয়াত না শুনাতেন যে, পূর্বের সকল নবী মৃত্যু বরণ করেছেন তাহলে এই উম্মত ধ্বংস হয়ে যেত, কেননা এরূপ অবস্থায় বর্তমান যুগের নৈরাজ্যবাদী আলেমরা এটিই বলতো যে, সাহাবীদেরও এই বিশ্বাসই ছিল যে, হযরত ঈসা জীবিত আছেন। কিন্তু এখন হযরত আবু বকর কর্তৃক উপরোক্ত আয়াত উপস্থাপন করার মাধ্যমে এই বিষয়ে সমস্ত সাহাবীর ইজমা হয়েছে যে, পূর্বের সকল নবী মৃত্যু বরণ করেছেন। বরং সেই ইজমা সম্পর্কে কবিতা রচিত হয়েছে। আবু বকর (রা.)-এর রূহের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা হাজার রহমতবারি বর্ষণ করুন। তিনি সবাইকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন। আর এই ইজমায় সকল সাহাবী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে একজনও এর বাইরে ছিলেন না। আর এটি সাহাবীদের প্রথম ইজমা ছিল এবং এটি যারপরনাই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করার ন্যায় কাজ ছিল। আবু বকর (রা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাঝে এক সাদৃশ্য রয়েছে। আর তা হলো পবিত্র কুরআনে উভয়ের সম্পর্কে খোদা তা'লার এই প্রতিশ্রুতি ছিল যে, ইসলামের ওপর যখন এক ভীতির অবস্থা ছেয়ে যাবে এবং মুরতাদ হওয়ার ধারা আরম্ভ হয়ে যাবে তখন তাদের আবির্ভাব ঘটবে। অতএব হযরত আবু বকর এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তদ্রুপই হয়েছে। অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর শত শত অজ্ঞ মরুবাসী মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়ে যায়, আর কেবল দুটি মসজিদ বাকি ছিল যেগুলোতে নামায পড়া হতো। হযরত আবু বকর পুনরায় তাদেরকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আর একইভাবে মসীহ্ মওউদ এর যুগে কয়েক লক্ষ মানুষ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে যায়। আর এই উভয় পরিস্থিতি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীরূপে তাদের উল্লেখ রয়েছে।"

(বারাহীনে আহমদীয়া পরিশিষ্টাংশ, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ২৮৫-২৮৬-এর টিকা)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, যখন সাহাবীগণ (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারেন তখন আনসাররা সাকিফা বনু সায়েদাতে একত্রিত হন। এই সমাবেশে খিলাফতের বিষয়ে আলোচনা হয়। আনসাররা খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন উবাদা-র চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হয়। (সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা- মহম্মদ সালাবী, পৃ: ১৭৪)

হযরত সা'দ বিন উবাদা তখন অসুস্থ ছিলেন। তিনি আনসারদের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং ইসলামের সেবার কথা বিস্তারিত উল্লেখ করে তাদেরকে খিলাফতের যোগ্য বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু আনসাররা হযরত সা'দ বিন উবাদাকেই খিলাফতের যোগ্য বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু আনসাররা তখনও পর্যন্ত তার বয়আত গ্রহণ করেনি, এর মাঝেই তাদের মধ্য থেকে কেউ এই প্রশ্ন করে যে, যদি মুহাজেররা তাকে খ লীফা হিসেবে মেনে না নেয়, তাহলে কী হবে? এর প্রেক্ষিতে একজন প্রস্তাব করেন যে, এক ব্যক্তি আনসারদের মধ্য থেকে এবং একজন মুহাজেরদের মধ্য থেকে খলীফা হোক। কিন্তু হযরত সা'দ বিন উবাদা এটিকে বনু অওস গোত্রের দুর্বলতা বলে আখ্যায়িত করেন। যখন আনসাররা সাকিফা বনু সায়েদাতে খিলাফত সম্পর্কে বিতর্ক করছিল তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব, হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ এবং অন্যান্য বড় বড় সাহাবীরা মসজিদে নববীতে মহানবী (সা .)-এর বিয়োগান্তক হৃদয়বিদারক ঘটনা সম্পর্কে কথা বলছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং আহলে বায়ত-এর অন্যান্য সদস্যরা মহানবী (সা.)-এর দাফন-কাফনের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত ছিলেন। খিলাফত সম্পর্কে কারো কোন চিন্তাই ছিল না আর তারা এই বিষয়ে অনবহিত ছিলেন যে,আনসাররা এই বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে এবং আনসারদের মধ্য থেকে কাউকে নির্বাচিত করতে চাচ্ছে। (সিদ্দীক আকবর, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, অনুবাদক- আঞ্জুম সুলতান শাহবাজ, পৃ: ৮৫-৮৬)

তাবাকাতে কুবরায় লিখা আছে, হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ (রা.)-এর কাছে আসেন এবং বলেন যে, আপনার হাত বাড়ান যাতে আমি আপনার বয়আত করতে পারি। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র ভাষায় আপনাকে এই উম্মতের আমীন আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আপনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এর পূর্বে আমি আপনার মাঝে এতটা উদাসীনতাপূর্ণ কথা কখনো দেখিনি। আপনি কি আমার বয়আত করবেন, অথচ আপনাদের মাঝে সিদ্দীক এবং সানীয়াসনাইন (তথা দুজনের মাঝে একজন) অর্থাৎ আবু বকর উপস্থিত আছেন? (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ১৩৫)

এই আলোচনার মাঝেই তারা আনসারদের জমায়েত সম্পর্কে জানতে পারেন। এতে হযরত উমর (রা.) ভেতরে সংবাদ প্রেরণ করে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে ডেকে পাঠান যে, জরুরী কাজ আছে। হযরত আবু বকর (রা.) দাফন-কাফনের ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে বাইরে আসতে অস্বীকৃতি জানান। এর প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) পুনরায় সংবাদ প্রেরণ করে যে, এমন এক তাৎক্ষণিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যেখানে আপনার উপস্থিতি আবশ্যক। এতে হযরত আবু বকর (রা.) বাইরে আসেন এবং হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, এই মুহূর্তে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাফন-কাফনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন্ কাজ থাকতে পারে, যার জন্য আপনি আমাকে ডেকেছেন? হযরত উমর (রা.) বলেন, আপনি কি জানেন আনসাররা সাকিফা বনু সায়েদায় একত্রিত হয়েছে আর হযরত সা'দ বিন উবাদা-কে খলীফা বানাতে চাচ্ছে? তাদের মাঝে এক ব্যক্তি বলেছে যে, একজন আমীর আমাদের মধ্য থেকে হবেন আর একজন আমীর কুরাইশদের মধ্য থেকে। একথা শুনতেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর এবং হযরত আবু উবায়দাকে সাথে নিয়ে সাকিফা বনু সায়েদা যান। সেখানে তখনও বিতর্ক চলছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাদের মাঝে গিয়ে বসে পড়েন।

(সিদ্দীক আকবর, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, অনুবাদক- আঞ্জুম সুলতান শাহবাজ, পৃ: ৮৬-৮৭) (সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা- আল হাজ্জ হাকীম গোলাম নবী, পৃ: ৭২-৭৩)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) বলেন, আমরা আনসারদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। যখন আমরা তাদের নিকটবর্তী হই, তখন তাদের মধ্য থেকে দুইজন পুণ্যবান ব্যক্তি উয়েম বিন সায়েদা এবং আম্মান বিন আদীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা দুজন আনসারদের ইচ্ছা সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করে প্রশ্ন করে যে, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? তারা বলেন, আমরা আমাদের এই আনসার ভাইদের কাছে যাচ্ছি। তারা উভয়ে বলেন, তাদের কাছে যাওয়া আবশ্যক নয়; আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাব। (সহী বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস-৬৮৩০) (সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০২১)

যাহোক, তারা সেখানে যান। হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা আনসারদের কাছে পৌঁছি। আমি মনে মনে একটি বিষয় বলার জন্য ভেবে রেখেছিলাম যে, আনসারদের সামনে তা বর্ণনা করব। অতএব আমি যখন তাদের কাছে পৌঁছি এবং কথা বলার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হই তখন হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে বলেন, থাম; যতক্ষণ না আমি কথা শেষ করি, এরপর তুমি যা খুশি বক্তব্য দিও। অতঃপর হযরত আবু বকর বক্তব্য আরম্ভ করেন আর আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা তিনি (রা.) বর্ণনা করে দেন, বরং তার চেয়েও অধিক বর্ণনা করেন। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

হযরত আবু বকর (রা.) যে বক্তৃতা করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো- হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুর রহমান (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) বক্তব্য আরম্ভ করেন। আল্লাহ্ তা'লার গুণগান ও প্রশংসাকীর্তণের পর তিনি বলেন, নিশ্চই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে রসূল এবং নিজ উম্মতের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রেরণ করেছেন যেন তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং তাঁর তওহীদ তথা একত্ববাদের কথা স্বীকার করে, অথচ ইতিপূর্বে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য উপাস্যের উপাসনা করতো এবং বলতো- এই উপাস্যরা খোদার কাছে তাদের জন্য সুপারিশকারী এবং কল্যাণকর; অথচ সেগুলো পাথরে খোদাই করা ছিল এবং কাঠ দ্বারা নির্মিত হতো। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন- وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ (সূরা ইউনুস: ১৯) অর্থাৎ, আর তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তার ইবাদত করে যা তাদের অপকারও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না এবং তারা বলে, এরা সবাই আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী। مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى (সূরা যুমার: ০৪) অর্থাৎ, আমরা তাদের কেবল এজন্য ইবাদত করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে নৈকট্যের উন্নত মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। আরবরা এ বিষয়টি পছন্দ করে নি যে, তারা তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করবে। অর্থাৎ হযরত আবু বকর(রা.) এই আয়াতগুলো পাঠ করে বলেন, আরবদের এই বিষয়টি পছন্দ হয় নি যে, তারা তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) জাতির মধ্য থেকে প্রাথমিক মুহাজেরদের মহানবী (সা.)-এর সত্যায়নের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর (সা.) ওপর ঈমান আনার জন্য আর তাঁর (সা.) প্রতি সহমর্মিতা এবং স্বজাতির পক্ষ থেকে চরম কষ্ট দেওয়া এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মুখে তাঁর (সা.) সাথে অবিচল থাকার জন্য বেছে নিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, অথচ সবাই তাঁর বিরোধী ছিল এবং তাঁর ওপর নির্যাতন করতো। কিন্তু নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতা এবং সকল মানুষের অন্যায়-অত্যাচার ও তাঁদের বিপক্ষে গোটা জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কখনো ভীত-ত্রস্ত হন নি। আর তারাই সবার আগে এই পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর ওপর ঈমান আনেন। আর তাঁরা মহানবী (সা.)-এর বন্ধু ও পরিবার-পরিজন এবং তাঁর (সা.) তিরোধানের পর মানুষের মাঝে এই পদমর্যাদার সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখে। এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারী ছাড়া অন্য কেউ তাদের সাথে বিতণ্ডা করবে না। হে আনসারগণ!

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 31 Mar, 2022 Issue No. 13

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তোমরা হলে তারা, যাদের ধমীয় বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়ার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আল্লাহ্‌র ধর্ম ও তাঁর রসূলের (সা.) সাহায্যকারী হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং মহানবী (সা.)-এর হিজরতও তোমাদের দেশেই নির্ধারণ করেছেন। তাঁর (সা.) সহধর্মিণী ও সাহাবীদের অধিকাংশই তোমাদের এখানে বসবাস করেন। প্রাথমিক মুহাজেরদের পর আমাদের কাছে তোমাদের ন্যায় মর্যাদার আর কেউ নেই। আমাদের মধ্য থেকে আমীর হবে আর তোমরা হবে সাহায্যকারী। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমাদের নিকট হতে পরামর্শগ্রহণ করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমাদের পরামর্শ ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না।(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪২-২৪৩)

হযরত আবু বকর সাকিফা বনু সায়েদায় যে বক্তব্য রাখেন, সীরাতে হালবিয়াতে এর বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, তিনি (রা.) বলেন, খিলাফতের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, আরবের লোকেরা কুরাইশদের ব্যতিরেকে অন্য কোন গোত্রের অনুকূলে এটি মেনে নেবে না। কুরায়েশের লোক বংশীয় মান-মর্যাদায় মাতৃভূমি মক্কার অধিবাসী হিসেবে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। বংশধারায় আমরা সমস্ত আরবের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ, কেননা এমন কোন গোত্র নেই যারা কোন না কোন ভাবে কুরায়েশের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখে না। অপর দিকে আমরা মুহাজিররা হলাম তারা, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছিল। আমরাই মহানবী (সা.)-এর আত্মীয় এবং বংশের লোক এবং রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়। আমরা আহলে নবুয়্যত এবং খিলাফতের অধিকার রাখি। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০৪-৫০৫)

এসব ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল নিজ মুসনাদে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ভূমিকা বর্ণনা করেছেন এবং উক্ত বর্ণনার পর যে, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর মুসলমানদের মাঝে বক্তব্য প্রদান করেন এবং মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর ঘোষণা দেন, এরপর বর্ণিত হয়েছে যে, বর্ণনাকারী বলেন, বক্তব্য প্রদান এবং মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) দ্রুত সাকিফা বনু সায়েদা'র দিকে রওয়ানা হন, অতঃপর তাদের কাছে পৌঁছলে হযরত আবু বকর (রা.) বাক্যালাপ শুরু করেন এবং তিনি (রা.) পবিত্র কুরআনে আনসাদের বিষয়ে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা থেকে কোন কিছু বাদ রাখেন নি এবং মহানবী (সা.) আনসারদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে যা কিছু বলেছেন- তা সব বর্ণনা করেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমাদের কি জানা আছে, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, সকল মানুষ যদি এক উপত্যকায় চলে যায় আর আনসাররা অন্য উপত্যকায় থাকে তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকায় হাঁটব?

এরপর হযরত সা'দ (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে সা'দ! তোমার নিশ্চয় স্মরণ থাকবে, তুমি বসে ছিলে আর মহানবী(সা.) বলেছিলেন যে, খিলাফতের অধিকারী হবে কুরায়েশ। মানুষের মাঝে যারা সবচেয়ে পুণ্যবান তারা কুরায়েশের পুণ্যবান সদস্যের অনুগামী হবে আর যারা পাপী তারা কুরায়েশের পাপীদের অধীনস্থ হবে। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হ্যাঁ আপনি সঠিক বলেছেন, আমরা 'উজির' এবং আপনারা 'আমীর'। (

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ আবু বাকার, হাদীস নং-১৮, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮-১৫৯, দারুল হাদীস কায়রো, ১৯৯৪)

আগামীতেও এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। অবস্থা চরম ভয়ানক রূপ ধারণ করতে পারে, বরং করবে আর (ভয়াবহতা) বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেবল একটি দেশ নয়, বরং এই উত্তেজনা যদি বাড়তে থাকে তাহলে অনেকগুলো দেশ এতে জড়িয়ে যাবে আর এর ফলাফল প্রজন্ম পরম্পরায় বিরাজমান থাকবে। আল্লাহ্ করুন, এরা যেন আল্লাহ্‌কে চিনতে পারে এবং নিজেদের জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যেন মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে।

আমরা কেবল দোয়া করতে পারি এবং করিও, তাদেরকে বুঝাতে পারি এবং বুঝাইও আর এক দীর্ঘ সময় ধরে আমরা এই কাজ করে চলেছি। কিন্তু এ দিনগুলোতে বিশেষত আহমদীদের অনেক দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করুন; যে বিষয়ে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না যে, কত ভয়ানক ধ্বংসযজ্ঞ হতে পারে।

নামাযের পর আমি এক ব্যক্তির অর্থাৎ মুরব্বী সিলসিলাহ্ মুকাররম খুশী মুহাম্মদ শাকের সাহেবের গায়েবানা জানাযা পড়াব। কয়েকদিন পূর্বে ৬৯ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার দাদা হযরত মৌলভী করীম বখ্‌শ সাহেবের মাধ্যমে যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি প্লেগের নিদর্শন দেখে বয়আত করেছিলেন।হযরত মৌলভী করীম বখ্‌শ সাহেবের স্ত্রী ফযল বিবি সাহেবার ভাই হযরত হাজী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ সাহেবও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। হযরত হাজী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের নাম আহমদীয়াতের ইতিহাসের অষ্টম খণ্ডে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের তালিকায় তেইশ নম্বরে উল্লেখ আছে। (তারিখে আহমদীয়াত, পরিশিষ্টাংশ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১১)

যাইহোক, খুশী মুহাম্মদ শাকের সাহেবের ব্যাপারে জানা যায় যে, তিনি ১৯৬৯ সনে মেট্রিক পাশ করেন। তারপর জীবন উৎসর্গ করেন ও জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। ১৯৭৭ সনে জামেয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৮ সনে আরবী ফাযেল পরীক্ষা পাশ করেন, এরপর জামা'তের কাজ করতে থাকেন। এর পাশাপাশি তিনি ১৯৮৭ সনে ইসলামিয়াত-এ এম.এ. ডিগ্রিও অর্জন করেন এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর ছাড়াও তিনি গিনি কোনা ক্রিতেও মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। সেখানে তিনি ফ্রেঞ্চ ভাষায়ও ডিপ্লোমা করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ছয়জন পুত্র দান করেছেন। তার এক ছেলে নাসের ইসলাম সাহেব জামা'তের মুরব্বী। বর্তমানে রাবওয়াতেই দায়িত্বরত আছেন।

১৯৭৭ থেকে ১৯৯১ সন পর্য ন্ত পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৯১ থেকে ২০০৭সন পর্যন্ত সিয়েরা লিওন ও গিনি কোনাক্রিতে কাজ করার সৌভাগ্য পান। সেখান থেকে ফিরে আসার পর ২০০৮ সন থেকে আঞ্জুমানের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এডিশনাল নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মকামী এবং নাযারত উমুরে আমা হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।তিনি যখন আফ্রিকায় ছিলেন, সেখানে তার মাধ্যমে বেশ ক'জন পবিত্রাত্মা আহমদীয়াতে অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার প্রচেষ্টায় কয়েকটি জামা'তও প্রতিষ্ঠিত হয়। খুবই নিবেদিতপ্রাণ ও পরিশ্রমী মুবাল্লেগ ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে তার বড়ই ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য করতেন তা বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ বর্ণনা করেছেন। ১৯৮৬ সনে কলেমা তাইয়্যেবা সংক্রান্ত মামলায় আল্লাহ্‌র পথে বন্দি হবারও তার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

তার স্ত্রী লিখেন যে,আমার সমগ্র জীবন এ বিষয়ের সাক্ষী যে, তিনি আজ পর্যন্ত না কখনো নামায ত্যাগ করেছেন আর না তাহাজ্জুদ। জামা'তী সফর থেকে ফিরে এসে ক্লান্তি সত্ত্বেও অবশ্যই নামায আদায় করতেন এবং বাজামা'ত আদায়ের চেষ্টা করতেন। চরম অসুস্থতা সত্ত্বেও বাজামা'ত নামায পড়তে অবশ্যই যেতেন। অগণিত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার অধিকার আদায়ে সর্বান্তঃকরণে নিয়োজিত থাকতেন। তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথে বিচরণকারী, খিলাফতের প্রকৃত অনুরাগী, আনুগত্যকারী, বিনয়ী, মুরব্বী ও জামা'তী কর্মকর্তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে যত্নবান, শিশুদের প্রতি স্নেহশীল, দানশীল, আত্মীয় ও দরিদ্রদের সাহায্যকারী, মিশুক ও তবলীগের বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী লোক ছিলেন। জীবনের অন্তিম দিনগুলোতেও যখন স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে যায় তখন তাকে তিন দিন তিন রাত জরুরী বিভাগে ভর্তি করতে হয়। যখনই ঘরে ফিরে আসতেন তাহাজ্জুদ নামায পরিত্যাগ করতেন না। একদিন তো হাসপাতাল থেকে আসেন আর ফযরের নামায পড়ে প্রস্তুতি নিয়ে অফিসে চলে যান। যাহোক, যখন তাকে বাধা দেওয়া হতো তখন বলতেন এটিই একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর কাজ এবং আমার কাজ থেকে আমাকে বিরত রেখো না।

তার ছেলে নাসের ইসলাম মুরব্বী সিলসিলাহ্ বলেন, যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে, বাবাকে সর্বদা তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত দেখেছি এবং আনুগত্যের উচ্চ মানে পেয়েছি। জামা'তের ছোট বড় যে কোন পর্যায়ের কর্মকর্তাই হোক, তাদের আনুগত্য করতেন। দৈনিক সদকা খয়রাত করা তার দৈনন্দিন রীতি ছিল। দিনের কাজ দিনেই করতেন। খুবই মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং তবলীগে খুবই অগ্রহ রাখতেন। তিনি বলেন, খাকসার স্বীয় পিতাকে নামাযে যাওয়ার সময় বা

এরপর ২ পাতায়.....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir